ইসলামী নীতি-দর্শন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ইসলামী নীতি-দর্শন

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

ইসলামী নীতি-দর্শন

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম

ভাষান্তর	ঃ	এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার
প্রথম সংস্করন	ঃ	জুলাই ১৯০৫ উর্দূ
বর্তমান সংস্করণঃ		মার্চ ২০২২ (কাদিয়ান)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	১০০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়া'ত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Islami Niti Darshan

By

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

The Promised Messiah & Mahdi[as]

Translator	:	Maulana A. H. M. Ali Anwar
First Edition	:	July 1905 Urdu
Present Edition	:	March, 2022 (Qadian)
Edited By	:	Bangla Desk; India
Copies	:	1000
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat; Sadr Anjuman Ahmadiyya,Qadian; Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

---

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

১৮৯৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে সৈয়্যদনা হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলাইহেস্ সালাম **'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী'** শিরোনামে একটি অনবদ্য ও অসাধারণ উর্দূ প্রবন্ধ রচনা করেন, যা সর্ব প্রথম ১৯৭৭ সালে বাংলা ভাষায় **'ইসলামী নীতি-দর্শন'** শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তিতে গ্রন্থটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ মোহতরম এ.এইচ.এম. আলী আনওয়ার সাহেব (বাংলাদেশ) করেছেন।

গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং আরবী সহ সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থটি সেটিং করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম (এম.এ) মুরুব্বি সিলসিলা। গ্রন্থটির পর্যবেক্ষণ ও মূল উর্দুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান,জনাব আবু তাহের মন্ডল সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়া'ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ। প্রুফ দেখেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা এবং জনাব জাহিরুল হাসান।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে গ্রন্থটি কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সার্বিক ভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

মার্চ ২০২২

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

‘ইসলামী নীতি-দর্শন’ পুস্তকের শত-বার্ষিকী প্রকাশনা উপলক্ষ্যে- সৈয়্যদনা আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে’

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (রহ.)-এর বাণী

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় এই বিখ্যাত অসাধারণ গ্রন্থখানির প্রকাশনার শতবর্ষ-পুর্তি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম পাঠ করা হয়েছিল লাহোরে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে ১৮৯৬ সালের ২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর প্রত্যেকটি থিসিস রচিত হয়েছিল ঐশী আশিসে ও কৃপায়। এবং এর একক সাফল্যের কথা অবহিত করা হয়েছিল আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ওহী-এর মাধ্যমে, যা প্রকাশিত করা হয়েছিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই।

একটি মুমিন সম্প্রদায়ের যেমনটি করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এই অনুষ্ঠানও হবে অর্থবহ এবং মর্যাদামন্ডিত। এবং তা থাকবে সর্বপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় কর্মকান্ড, আজেবাজে প্রদর্শনী ও আনন্দ-উল্লাস থেকে মুক্ত। তাই, আমরা এই গ্রন্থটির শত-বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করছি প্রধান প্রধান প্রায় সকল ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত করার মাধ্যমে। ফলে, আমরা আশা করি যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই এই পুস্তকের কল্যাণরাজি আহরণ করতে সমর্থ হবে।

আল্লাহ্‌তা’লার বিশেষ ফযলে ও কৃপায় আমরা এ পর্যন্ত পৃথিবীর বাহান্নটি বড় বড় ভাষায় এই গ্রন্থের তর্জমা সম্পূর্ণ করেছি এবং তা প্রকাশও করেছি। এছাড়া, বাদবাকী প্রধান ভাষাগুলির কয়েকটিতেও অনুবাদের কাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা আশা করি, খোদার ফযলে এই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে ১৯৯৬ সন শেষ হওয়ার পূর্বেই।

এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করার জন্য যাঁরা যাঁরা তাঁদের ক্ষমতা, সময় ও শ্রমের কোরবানী করেছেন, আল্লাহ্‌তা’লা তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

জানুয়ারী, ১৯৯৬ — **মির্যা তাহের আহ্‌মদ**

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ

ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

ٹائٹل بار اوّل

اسلامی اصول کی فلاسفی

یا

اسلام اور اسکی حقیقت

یعنی تقریر حضرت حجۃ اللہ میرزا غلام احمد صاحب
مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام جسکو
جلسہ مذاہب عظیم الشان منعقدہ لاہور میں مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے
پڑھکر سنایا ۔ اور اس میں حکیم الامۃ حضرت مولانا نور الدین صاحب
کی تقریریں اور حضرت میر ناصر نواب صاحب کی نظم بھی شامل کیگئی ہیں
جو انھوں نے جلسہ مذکور میں سنائیں

مطبع ضیاء الاسلام قادیان دارالامان میں مولوی حکیم
فضل الدین صاحب کے اہتمام سے چھپکر شائع ہوئی

ماہ جولائی — قیمت — تعداد

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পটভূমি ও গ্রন্থ-পরিচিতি	1-14
সত্যান্বেষীগণের জন্য মহা সুসংবাদ	15
ইসলাম ঃ দাবী ও দলিল প্রমাণ ঐশীগ্রন্থ হইতে হওয়া জরুরী	17
প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ	
মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা	18
মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা	18
প্রথম উৎস ঃ নাফ্সে আম্মারাহ্	18
দ্বিতীয় উৎস ঃ নাফ্সে লাউওয়ামাহ	19
তৃতীয় উৎস ঃ নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ্	20
আত্মার সৃষ্টি হওয়া বিষয়ে	29
আত্মার দ্বিতীয় জন্ম	30
মানুষের ক্রমাগত উন্নতি	30
ইসলামের সত্যতা	31
স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য	32
জীব হত্যার অপবাদ খন্ডন	33
ইস্লাহের (সংশোধনের) তিনটি পদ্ধতি	35
ইস্লাহের চরম প্রয়োজনের সময়ে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব	36
কুরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ইস্লাহ সাধন ঃ	37
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বভাবজ অবস্থাকে নৈতিকতায় রূপ দান	38
প্রকৃত নৈতিকতা	39
খাল্ক ও খুল্ক	40
প্রথম ইস্লাহ ঃ স্বভাবজ অবস্থার সংশোধনী	42
শূকর নিষিদ্ধ (হারাম)	48
মানুষের নৈতিক অবস্থা	49
অকল্যাণ পরিহার সম্পর্কিত চারিত্রিক গুণ	50
কাম-সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায়	54

বিষয়	পৃষ্ঠা
কল্যাণ সাধনের উপায়সমূহ	63
প্রকৃত বীরত্ব	71
সত্যবাদিতা	73
সব্‌র বা ধৈর্য	75
সহানুভূতি	77
এক পরম উর্দ্ধতন অস্তিত্বের অন্বেষণ	78
আঁ-হযরত (সা.)-এর আরবে আবির্ভাব হওয়ার তাৎপর্য	81
দুনিয়ার উপরে কুরআন করীমের অনুগ্রহ	82
মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ	83
মহান স্রষ্টার গুণাবলী	87
রূহানী (আধ্যাত্মিক) অবস্থাসমূহ	94
একটি অতি প্রিয় দোয়া	98
কর্পূর ও আদা মিশ্রিত শরবতের তত্ত্বকথা	104
যাঞ্জাবিলের ক্রিয়া	105
আল্লাহ্‌তা'লার সহিত নিবিড় রূহানী সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়	112
দ্বিতীয় প্রশ্ন	
মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থা কি হয়?	115
পরলোক সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত তিনটি তত্ত্ব ঃ মারেফাত	119
মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সূক্ষ্ম কথা	120
তিন প্রকারের জ্ঞান ঃ	121
তিন জগৎ ঃ	122
তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব	128
তত্ত্বজ্ঞানের তৃতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব	131
তৃতীয় প্রশ্ন	
মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং উহা লাভ করিবার উপায় কী?	133
মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে লাভ করার উপায়	136
চতুর্থ প্রশ্ন	
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কর্ম অর্থাৎ বিধিনিষেধ বা শরীয়ত পালনের ফলাফল কী?	143

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তুর কসম (শপথ) তত্ত্ব	146
পঞ্চম প্রশ্ন	
মা'রেফাত এলাহী (ঐশী জ্ঞান) লাভের উপায়	151
মানব স্বভাব-তত্ত্ব	155
এলহাম (ঐশী-বাণী) বলিতে কি বুঝায়?	158
ইসলামের বিশেষত্ব	161
প্রবন্ধ প্রণেতার ঐশীবাণী প্রাপ্তির মর্যাদা	162
পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদাতা'লার এলহাম	163
আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনের দুই যামানা	167
আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের উদ্দেশ্য	171

পটভূমি ও গ্রন্থপরিচিতি

স্বামী সাধু শোগান চন্দ্র নামক এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক, যিনি তিন / চার বছর যাবৎ হিন্দুদের কায়স্থ গোত্রের সংস্কার সাধনের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, ১৮৯৬ সালে তাঁর মনে এই চিন্তার উদ্রেক হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল মানুষ একত্রিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লাভ হবে না। অবশেষে, তিনি একটি ধর্মীয় সম্মেলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তদনুযায়ী, এ ধরনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আজমীরে। অতঃপর, তিনি ১৮৯৬ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য লাহোরকে উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

জনাব স্বামী সাহেব এই ধর্মীয় কন্‌ফারেন্স-এর জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রেসিডেন্ট হন জনাব মাস্টার দুর্গা প্রসাদ এবং চীফ্ সেক্রেটারী লাহোর চীফ কোর্টের জনৈক হিন্দু উকিল জনাব লালা ধনপত রায় বি.এ, বি.এল। কন্‌ফারেন্সের তারিখ নির্ধারিত হলো ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খ্রীঃ। সম্মেলনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত করা হলো ছয় ব্যক্তিকে। এবং তাঁরা হলেন ঃ

১. জনাব রায় বাহাদুর বাবু প্রতুল্ল চন্দ্র, জজ, চীফ্ কোর্ট, লাহোর

২. জনাব খান বাহাদুর খোদা বখ্‌স, জজ্, স্মল কজেজ কোর্ট, লাহোর

৩. জনাব রায় বাহাদুর পন্ডিত রাধাকৃষ্ণ, উকিল, চীফ্ কোর্ট, সাবেক গভর্ণর, জম্মু

৪. হযরত মৌলবী হেকীম নূর উদ্দীন (রাঃ), শাহী চিকিৎসক

৫. জনাব রায় ভবানী দাস এম.এ.এক্সট্রা এসিষ্ট্যান্ট অফিসার, ঝিলাম

৬. সরদার জওহর সিং, সেক্রেটারী খাল্‌সা কমিটি, লাহোর

স্বামী শোগান চন্দ্র কমিটির পক্ষ থেকে সম্মেলনের জন্য প্রকাশিত ইশ্‌তিহারে মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং আর্যদেরকে কসম দিয়ে বললেন, তাঁদের প্রখ্যাত আলেমগণ যেন এই সম্মেলনে (অংশ গ্রহণ করে) নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করেন। তিনি আরও লিখলেন, বড় বড় ধর্মগুলির এই (আন্তঃধর্মীয়) সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে লাহোর টাউন হলে। এবং এর পিছনে উদ্দেশ্য এটাই যে, এতে করে যেন সত্য ধর্মের সৌন্দর্য, ঔৎকর্ষ এবং গুণাবলী অনুরাগীদের এক সাধারণ সমাবেশে প্রকাশিত হয় এবং তার প্রতি সকলের হৃদয়ে অনুরাগ ও ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং তার দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ যেন সকলে যথাযথরূপে অনুধাবন করতে পারে। এবং এই উপায়ে যেন প্রত্যেক ধর্মের সম্মানিত বুযুর্গ বক্তা তাঁর নিজ ধর্মের সত্যতাকে অন্যান্যদের হৃদয়ে স্থান করে দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এবং শ্রোতারাও যেন এই সুযোগ লাভ করে যে, বুযুর্গদের এই সমাবেশে তারা একজনের বক্তৃতার সঙ্গে আর একজনের বক্তৃতা তুলনা করে দেখবে এবং যার মধ্যে সত্যের জ্যোতিঃ দেখতে পাবে তাকেই গ্রহণ করবে।

আজকাল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৃষ্ট বিতর্কের কারণে সত্য ধর্মকে জানার জন্য মানুষের মনে আগ্রহেরও সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা বোধ করি এটাই যে, প্রতিটি ধর্মের বুযুর্গ ব্যক্তিরা যাঁরা ওয়াজ-নসীহত করে থাকেন তাঁরা সবাই একত্রে সমবেত হবেন এবং পূর্ব-প্রকাশিত কিছু প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করবেন। অতএব, বড় বড় ধর্মগুলির এই সম্মেলনে, যে ধর্মটি সত্য পরমেশ্বরের তরফ থেকে হবে, তা অবশ্যই তার আপন আলোকের প্রতিফলন দেখাতে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই এই জলসার আয়োজন। প্রত্যেক জাতির বুযুর্গ বক্তাগণের প্রত্যেকেই ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর স্বধর্মের সত্যতা প্রকাশ করা তাঁর জন্য ফরয। সুতরাং, যে অবস্থায়, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে, তা হচ্ছে, সত্য প্রকাশিত হোক। কাজেই খোদাতা'লাও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন, যা সব সময় মানুষের জন্য সৃষ্টি হওয়াটা সম্ভবপর হয় না।

অতঃপর, তিনি প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে লিখেন ঃ

'কী! আমি কি একথা মেনে নিতে পারি যে, এক ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যান্য ব্যক্তিরা এক প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং সে এই দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করে যে, তাদের নিরাময়ের ঔষধ কেবল তারই কাছে আছে, এবং সে মানুষের প্রতি সহানুভূতিও রাখে; আর এই অবস্থায় গরীব রোগীরা তাকে চিকিৎসার জন্য ডাকলে সে জেনে শুনেই চুপ করে থাকবে? আমার প্রাণ তো এইজন্যই ছটফট করছে যে, এটা ফায়সালা হয়ে যাক, কোন্ ধর্ম সত্য এবং সত্যতায় পরিপূর্ণ। আমার অন্তরের এই গভীর আবেগ আমি যে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো, তা আমার জানা নেই।'

লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ধর্মগুলির এ সম্মেলনে যোগ দান করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ স্বামী সাহেবের দাওয়াত কবুল করলেন। ১৮৯৬-এর ডিসেম্বরে বড়দিন উদ্‌যাপনের সময়ে লাহোরে এই আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ জলসা কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দান করালেন যে, কেবল সেই সকল প্রশ্নের উপরেই বক্তৃতা করা যাবে, যা কমিটির পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করা হয়েছিল উত্তর তৈরীর জন্য। এইসব প্রশ্নের উত্তর তৈরীর ব্যাপারে কমিটি একটি শর্ত আরোপ করেছিল। শর্তটি ছিল, বক্তৃতাকারী তাঁর বক্তব্যকে যথাসাধ্য সেই কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন, যে কিতাবকে তিনি তাঁর ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বলে মান্য করেন।

প্রশ্নগুলি ছিল ঃ

১. মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কি?

২. মানবজীবনের পারলৌকিক অবস্থা কি?

৩. ইহলোকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কি?

৪. ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে কর্মের ফল কি?

৫. জ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায় কি?

এই সম্মেলন, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, তাতে সনাতন ধর্ম, হিন্দুইজ্‌ম, আর্য সমাজ, ফ্রি থিংকার্স, ব্রাহ্মসমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, রিলিজিয়ন্স অব হার্মনী, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম এবং শিখইজ্‌ম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তৃতা করেন। কিন্তু, এই সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে মাত্র একটি বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছিল সঠিকরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে। যখন এই বক্তৃতাটি হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) তাঁর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা শুরু করলেন তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কোন ধর্মের এমন কোন লোক তখন ছিলেন না যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রসংশাসূচক ধ্বনি (নারা) বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করা থেকে বিরত ছিলেন। এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যাঁর উপরে গভীর আনন্দ ও তন্ময় অবস্থার প্রভাব পড়েনি। বর্ণনাশৈলী ছিল অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং প্রত্যেকের নিকটে প্রিয়, আকর্ষণীয়। এই প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ এর চাইতে আর কী হতে পারে যে, বিরুদ্ধবাদীগণ পর্যন্ত প্রসংশায় গদগদ হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পত্রিকা **'সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট'**, লাহোর, খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও এই প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেছে এবং একে অবিস্মরণীয় বলে উল্লেখ করেছে।

এই প্রবন্ধের রচয়িতা হচ্ছেন **জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ.)**। এই প্রবন্ধের পাঠ নির্ধারিত দুই ঘন্টায় সমাপ্ত না হওয়ায় সম্মেলনের দিন ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। **'পাঞ্জাব অবজার্ভার'** এই প্রবন্ধের আলোচনায় কলামের পর কলাম মন্তব্য লিখেছিল। **'পায়সা আখবার'**, **'চৌধুঁই সদী'** (রাওয়ালপিন্ডি), **'মাখযামে দেকান'**, **'সাদেকুল আখবার'** এবং **'জেনারেল ও গওহর আসফী'** প্রভৃতি পত্রিকা বিনা ব্যতিক্রমে এই প্রবন্ধের আলোচনা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য জাতি ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এই প্রবন্ধটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে

স্বীকার করেছেন। এই ধর্মীয় কনফারেন্সের সেক্রেটারী লালা ধনপত রায় বি.এ., বি.এল, উকীল চীফ কোর্ট, পাঞ্জাব, এই বক্তৃতা সম্পর্কে **'রিপোর্ট জলসা আ'যম মযাহেব (ধরম মহোৎসব)'** নামক পুস্তকে লিখেছেন ঃ-

"পণ্ডিত গোবর্দ্ধন দাস সাহেবের বক্তৃতার পর বাকী ছিল মাত্র আধা ঘন্টা সময়। এই বক্তৃতার পর ইসলামের একজন প্রখ্যাত প্রবক্তার পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। তাই, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের কেউই তাদের নিজ নিজ আসন ছেড়ে যাননি। দেড়টা বাজার তখনও ঢের বাকী। ইসলামিয়া কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গন (পরে নির্ধারিত স্থান) শীঘ্র শীঘ্র ভরে যেতে লাগলো এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রাঙ্গন লোকে ভরে গেল। তখন সেখানে প্রায় সাত আট হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন সোসাইটির বহু জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যদিও চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাস ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত ছিল, তবু শত শত লোকের দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এবং দাঁড়িয়ে থাকা এইসব শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের বড় বড় বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বড় বড় আলেম-ফাযেল, ব্যারিস্টার, উকীল, প্রফেসর, এক্সট্রা এ্যাসিসট্যান্ট (অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেট), ডাক্তার এক কথায় সমাজের উচ্চ স্তরের নানা শ্রেণীর ও পেশার লোকজন। এবং এই সমস্ত লোকজনের একত্রে জমা হওয়া এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এক নাগাড়ে চার/পাঁচ ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাটাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, ঐ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির মনে সেই পবিত্র বিষয় সম্পর্কে জানবার জন্য কত বেশী প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল। বক্তৃতার (প্রবন্ধের) রচয়িতা তো সশরীরে সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর এক বিশিষ্ট শিষ্য জনাব মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটীকে প্রবন্ধ পাঠের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য যদিও কমিটির পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময় ছিল মাত্র দু'ঘন্টা, কিন্তু জলসায় উপস্থিত সুধীবৃন্দের সকলের মনে এই

প্রবন্ধের প্রতি এমন এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, মডারেটর সাহেবান অত্যন্ত জোশের এবং খুশীর সঙ্গে এই অনুমতি দিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবন্ধের পাঠ শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জলসার কার্যক্রমও শেষ হবে না। তাঁদের এই ঘোষণা জলসার কর্মকর্তা এবং উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর ইচ্ছানুসারেই দেওয়া হয়েছিল। কেননা, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মৌলবী আবু ইউসুফ মোবারক আলী সাহেব তাঁর নিজের সময় এই প্রবন্ধের পাঠ শেষ করার জন্য ছেড়ে দিলেন, তখন উপস্থিত সকলেই এবং মডারেটর সাহেবেরাও খুশীর চোটে সমস্বরে নারা ধ্বনি দিয়ে মৌলবী সাহেবকে শুকরিয়া জানালেন। সম্মেলনের কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল সাড়ে চারটায়। কিন্তু, অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম সাড়ে পাঁচটার পরেও জারি রাখতে হয়েছিল। কেননা, এই প্রবন্ধের পাঠ শেষ করতে সময় লেগেছিল প্রায় চার ঘন্টা এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর আকর্ষণ ও হৃদয় গ্রাহিতা অক্ষুণ্ন ছিল।"

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ২১শে ডিসেম্বর (১৮৯৬) তারিখে আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এই প্রবন্ধের বিজয়ী হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে খবর পেয়ে একটি ইশতিহার প্রকাশ করেছিলেন। (**'সত্যান্বেষীগণের জন্য মহা সুসংবাদ'** শীর্ষক উক্ত ইশতিহারটি অত্র পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)। এখানে সঙ্গত কারণেই দু'তিনটি পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি ঃ

'দি সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট' (লাহোর), লিখেছে ঃ

"এই জলসার শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে বিশেষ আকর্ষণ ছিল মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীর বক্তৃতার প্রতি, যা ছিল ইসলামের সাহায্য ও হেফাযতের জন্য অত্যন্ত সুদক্ষ সফল ও উৎকর্ষমন্ডিত। এই বক্তৃতা শোনার জন্য দুরের ও কাছের বিভিন্ন ফের্কার বা মতবাদের অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছিল। যেহেতু, মির্যা সাহেব নিজে উপস্থিত হতে পারেন নি, সেহেতু এই বক্তৃতা তাঁর এক

সুযোগ্য শিষ্য মুন্সী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী পাঠ করে শোনান। ২৭ তারিখে এই বক্তৃতা তিন ঘন্টা ধরে চলছিল, এবং জনসাধারণ তা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিল। কিন্তু, ততক্ষণ পর্যন্ত মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দান সমাপ্ত হয়েছিল। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি সময় দেওয়া হয়, তাহলে বাকী অংশও শোনাবেন, তাই ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সভাপতি সাহেব এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন যে, ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জলসার তারিখ বাড়িয়ে দেওয়া হোক।"

'চৌধুঁই সদী' (রাওয়ালপিন্ডি), হযরত আকদস ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম- এর এই বক্তৃতার উপরে নিম্নলিখিত আলোচনা করেছে ঃ

"সব ক'টি বক্তৃতার মধ্যে যে বক্তৃতাটি ছিল সম্মেলনের প্রাণ সঞ্চারকারী, তা ছিল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর। তাঁর বাগ্মিতাপূর্ণ বিখ্যাত সেই বক্তৃতা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সুললিত কন্ঠে পাঠ করে শোনান। এই বক্তৃতা শেষ হয় দুই দিনে। ২৭শে ডিসেম্বর প্রায় চার ঘন্টা এবং ২৯ শে ডিসেম্বর দু'ঘন্টা, মোট ছ' ঘন্টায় এই বক্তৃতা শেষ হয়, যা আকারে একশ' পৃষ্ঠা হবে। প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাক্যের সমাপ্তিতে (শ্রোতাদের) প্রশংসার ধ্বনি বুলন্দ হয়ে উঠছিল। এবং কখনও কখনও এক একটা বাক্যকে দ্বিতীয় বার পড়ার জন্য উপস্থিত জনতার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হচ্ছিল। জীবনভর আমাদের কান এমন শ্রুতিমধুর বক্তৃতা আর শোনেনি। অন্যান্য ধর্মের লোক যাঁরা বক্তৃতা করেছেন, সত্য তো এটাই যে, তাঁদের বক্তৃতায় জলসার প্রশ্নাবলীর কোন উত্তরই ছিল না। প্রায় সব বক্তাই শুধু চতুর্থ প্রশ্নের উপরেই কথা বলেছেন, বাকী প্রশ্নগুলির ব্যাপারে তাঁরা খুব সামান্যই বলেছেন। প্রায় সব ভদ্রলোকেরই অবস্থা তো এই ছিল যে, তাঁরা অনেক বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কথায় কোন প্রাণ ছিল না, একমাত্র মির্যা সহেবের বক্তৃতা ছাড়া। কেবল তাঁরই বক্তৃতায় ছিল প্রত্যেকটি প্রশ্নের আলাদা আলাদা

বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ জবাব। এবং তা সম্মেলনে উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সানন্দে শুনেছে। এবং তা সকলের কাছেই অত্যন্ত মূল্যবান ও অতিশয় প্রসংশাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।"

"আমরা মির্যা সাহেবের মুরীদ নই, তাঁর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু, সততাকে তো আমরা কখনই জলাঞ্জলী দিতে পারি না। কোন ন্যায়বান ও সুস্থবিবেক তা করতেই পারে না। মির্যা সাহেব সমস্ত প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন (যেমনটা দেওয়ার কথা ছিল)। কোরআন শরীফ থেকে তিনি ইসলামের বড় বড় শিক্ষা ও মতাদর্শকে যুক্তি-বুদ্ধির দলিল ও দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা অলংকৃত করেছেন। প্রথমে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা উলুহীয়্যত বা ঈশ্বরত্বের সমস্যার সমাধান দেওয়া, অতঃপর তারই সমর্থনে কালামে ইলাহী (অর্থাৎ কোরআন শরীফ) থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার মধ্যে একটা আশ্চর্য মহিমা প্রকাশিত হচ্ছিল। মির্যা সাহেব শুধু কোরআনী শিক্ষাসমূহেরই দার্শনিক ব্যাখ্যা দান করেন নি, বরং সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের শব্দাবলীরও অন্তর্নিহিত ভাব ও দার্শনিক তাৎপর্যেরও ব্যাখ্যা দান করেছেন। সংক্ষেপে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতা ছিল সামগ্রিকভাবে একটি সফল, পরিপূর্ণ ও পারফেক্ট বক্তৃতা। এই বক্তৃতার মধ্য থেকে অগণিত মা'রেফতের জ্ঞান, সূক্ষ্মতত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও গভীর রহস্যে ভরা মুক্তোর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এর বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল দার্শনিকদের রচনার এমন এক স্টাইলে যাতে সকল ধর্মের লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় সারাটা হলঘর, ভিতরে, বাইরে যেভাবে জনাকীর্ণ ছিল, সেভাবে অন্য আর কোন বক্তৃতার সময় ছিল না। শ্রোতাগণ সবাই মুগ্ধ ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। মির্যা সাহেবের বক্তৃতা এবং অপরাপর বক্তাগণের বক্তৃতার তুলনায় শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, মির্যা সহেবের বক্তৃতার সময় জনগণ এমনভাবে ভীড় জমিয়েছিল যেমন মধুর উপরে মাছিরা ভীড় জমায়। কিন্তু অন্যান্য বক্তৃতা গুলোর সময় ভাল না লাগার

কারণে লোকেরা উঠে উঠে যাচ্ছিল। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর লেকচার ছিল অত্যন্ত মামুলী ধরনের। এর মধ্যে ঐ সমস্ত মোল্লায়ী ধ্যান-ধারণাই ছিল, যা কিনা লোকেরা প্রতিদিন শুনে থাকে। এর মধ্যে না ছিল কোন গভীর জ্ঞানের কথা না কোন নূতন কথা। এই নামজাদা মৌলবী সাহেবের দ্বিতীয় বক্তৃতার সময় অনেক লোক উঠে চলে গিয়েছিল। এছাড়া, এই সম্মানিত মৌলবী সাহেবকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করার জন্য কয়েক মিনিট সময়ও বেশী দেওয়া হয়নি।" - (চৌঁধূই সদী, রাওয়ালপিন্ডি, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ ইং)।

'জেনারেল ও গওহর আফসী' ২৪ শে জানুয়ারী (১৮৯৭) সংখ্যায় **"লাহোরে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন"** এবং **"ইসলামের বিজয়"** শিরোনামে দুটি নিবন্ধে লিখেছে ঃ

"সম্মেলনের কার্যক্রম সম্পর্কে কথাবার্তা বলার আগে এটা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের পত্রিকার কলামগুলিতে এ বিষয়টা নিয়ে এক বিতর্ক হয়ে গেছে। তা থেকে **আমাদের পাঠকরা ভালভাবেই জানেন যে, এই ধর্মীয় মহাসম্মেলন ইসলামের পক্ষে ওকালতি করার জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে ছিলেন?** আমাদের একজন সম্মানিত প্রতিবেদক সর্বপ্রথম নিরপেক্ষ মন নিয়ে এবং সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এক্ষেত্রে যাঁকে নির্বাচিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন **কাদিয়ানের রইস (প্রধান বা চীফ) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব**। এবং এর প্রতি ঐক্যমত প্রকাশ করেছিলেন আমাদের আর একজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখে। জনাব মৌলবী ফখরুদ্দীন সাহেব ফখর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর যে স্বাধীন যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান অভিমত জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন তাতেও হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (রইসে কাদিয়ান)-এর কথাই বলা হয়েছিল। আলীগড়ের জনাব স্যার সৈয়্যদ আহ্মদ সাহেবকেও (বক্তৃতা দানের জন্য) নির্বাচন করা হয়েছিল। এবং একই সঙ্গে ইসলামের পক্ষে ওকালতীর জন্য যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছিল, তাঁরা হচ্ছেন, জনাব

মৌলবী আবু সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী, জনাব মৌলবী হাজী সৈয়্যদ মোহাম্মদ আলী সাহেব কানপুরী এবং মৌলবী আহ্মদ হোসেন সাহেব আযিমাবাদী। এখানে একথার উল্লেখ করাও অসমীচীন হবে না যে, আমাদের একটি স্থানীয় পত্রিকার একজন সংবাদদাতা তফসীরে হাক্কানীর লেখক জনাব মৌলবী আব্দুল হক সাহেব দেহলবীকেও এই কাজের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।"

অতঃপর স্বামী শোগান চন্দ্রের ইশতিহারের সেই অংশ, যেখানে তিনি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ধর্মের আলেমদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁদের স্ব স্ব ধর্মের মণি-মুক্তো প্রদর্শন করার জন্যে, তার উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত প্রত্রিকাটি লিখেছে ঃ

"এই জলসার ইশতিহার ইত্যাদি দেখার পর এবং আমন্ত্রণ লাভের পর হিন্দুস্থানের কোন্ কোন্ মনীষীর হিম্মতের শিরা-উপশিরায় এই উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁরা দ্বীনে-ইসলামের পক্ষে ওকালতী করবেন। এবং তাঁরা ইসলামের সহায়তার জন্য কতটা দায়িত্বভার গ্রহণ করে দলীল ও যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে ফুরকানী-বিস্ময়ের বিজয় অন্য সব ধর্মের প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন (তা জানা দরকার)।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, সম্মেলনের কর্মকর্তারা বিশেষ করে মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব এবং স্যার সৈয়্যদ আহ্মদ সাহেবকে সম্মেলনে শরীক হওয়ার জন্য পত্র লিখেছিলেন। হযরত মির্যা সাহেব তো শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজে জলসায় শরীক হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর একজন বিশিষ্ট শাগরেদ জনাব মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটীকে সেই প্রবন্ধ পাঠের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু জনাব স্যার সৈয়দ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা এবং প্রবন্ধ পাঠানো থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এটা এজন্য ছিল না যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, এবং এ ধরনের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার মত সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এবং এটা এজন্যেও ছিল না যে, ঐ

সময়টাতে **'এডুকেশনাল কনফারেন্স'** এর অনুষ্ঠান মীরাটে হওয়ার কথা ছিল। বরং এর কারণ এটাই ছিল যে, ধর্মীয় জলসা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কোন যোগ্য বিষয় নয়। কেননা, তিনি তাঁর চিঠিতে, যা ইনশাআল্লাহ্, আমরা আমাদের পত্রিকায় আগামী এক সময় প্রকাশ করবো, তাতে পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন যে, তিনি কোন ওয়াজ-নসীহতকারী মৌলবী নন, আর এতো হচ্ছে ওয়াজকারী ও নসীহতকারীদের কাজ। **জলসার প্রোগ্রাম দেখে এবং অন্য সব কিছু দেখে শুনে মনে হয়েছে যে, জনাব মৌলবী সৈয়্যদ মোহাম্মদ আলী সাহেব কানপুরী, জনাব মৌলবী আব্দুল হক সাহেব দেহলবী, জনাব মৌলবী আহ্মদ হোসেন সাহেব আযিমাবাদী এই জলসার প্রতি কোন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দেননি। এবং আমাদের সম্মানিত আলেমদের কোন সম্প্রদায়ের কোন সুযোগ্য ব্যক্তিও (এই সম্মেলনে) তাঁর কোন প্রবন্ধ পড়বার বা পড়াবার কোন ব্যবস্থা নেননি। তবে, হ্যাঁ, দু'একজন আলেম 'আমরা এর মধ্যে আছি'- মা নাহ্নো ফিহা- বলে কদম বাড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু উল্টো দিকে। এজন্য তাঁরা হয় এই নির্ধারিত বিষয়-বস্তু নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন, নয়তো অর্থহীন কিছু চেঁচামেচি করেছেন মাত্র।** বিষয়টা আমরা তুলে ধরবো আমাদের আগামী প্রতিবেদনে। সংক্ষেপে, সম্মেলনের কর্মকাণ্ড থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, **রইসে কাদিয়ান হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেবই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রতিযোগিতার ময়দানে ইসলামী বীরত্বের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।** এবং এই নির্বাচনকে যথার্থ প্রমাণিত করেছেন, যা তাঁকে ইসলামের স্বপক্ষে উকীল নিয়োজিত করার ব্যাপারে পেশাওয়ার, রাওয়ালপিন্ডি, ঝিলাম, শাহপুর, ভেরা, খোশহাব, শিয়ালকোট, জম্মু, উজীরাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, লুধিয়ানা, শিমলা, দিল্লী, আম্বালা, রিয়াসতে পাটিয়ালা, দেরাদুন, মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), বাঙ্গালোর প্রভৃতি হিন্দুস্থানী শহরের বিভিন্ন ইসলামী ফেরকা বা সম্প্রদায়ের নিকট থেকে যথারীতি স্বাক্ষরিত ওকালত নামার মাধ্যমে

কার্যকর করা হয়েছিল। সত্য তো এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি এই সম্মেলনে হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ না হতো, তাহলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্মুখে ইসলামপন্থীদের কপালে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কলঙ্ক অঙ্কিত হতো। কিন্তু খোদার শক্তিশালী হস্ত পবিত্র ইসলামকে পতন থেকে রক্ষা করেছে। উপরন্তু এই প্রবন্ধের বদৌলতে তাকে এমন বিজয় দান করেছে যে, স্বমতাবলম্বীরা তো বটেই, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠেছে, এই প্রবন্ধই সবার উপরে উত্তীর্ণ, সবার উপরে। এবং প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সত্যানুরাগী অপর সকলের মুখ থেকেও এই কথা উচ্চারিত হচ্ছিল যে, আজ ইসলামের সত্যতা উন্মোচিত হলো, এবং ইসলাম বিজয় লাভ করলো। যে নির্বাচন দিনের আলোকে লক্ষ্য ভেদ করায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, তাতে বিরুদ্ধবাদীদেরও সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ ছিল না। এটাই ছিল আমাদের গৌরব ও আনন্দের কারণ। এবং তা এজন্যই যে, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের মাহাত্ম্য। আর সত্য তো এটাই। যদিও, এটা ছিল হিন্দুস্থানের বড় বড় ধর্মগুলোর দ্বিতীয় সম্মেলন, তবুও এটা আপন শান ও শওকতে, মর্যাদায় ও মাহাত্ম্যে সারা হিন্দুস্থানের সব কংগ্রেস ও কনফারেন্সগুলোকে হার মানিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের রইস-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই জলসায় শরীক হয়েছিলেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এটা প্রকাশ করতে চাই যে, আমাদের মাদ্রাজও এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। জলসার আকর্ষণ এতটাই বেড়েছিল যে, তা নির্ধারিত তিন দিনের পর আরও একদিন বাড়াতে হয়েছিল। জলসা অনুষ্ঠানের জন্য কমিটির কর্মকর্তারা লাহোরের সব চাইতে বৃহৎ ও প্রশস্ত স্থান ইসলামিয়া কলেজকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু, মানুষের সমাগম এত বেশী হয়েছিল যে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। জলসার আযমত বা মাহাত্ম্যের বড় প্রমাণ এটাই যে, সারা পাঞ্জাবের মহৎ-প্রধান ব্যক্তিরা ছাড়াও চীফকোর্ট ও হাইকোর্ট (এলাহাবাদ)-এর মাননীয় বিচারপতি বাবু প্রতুল চন্দ্র সাহেব এবং মিঃ বীজ জী সানন্দে জলসায় অংশগ্রহণ

করেছিলেন।"।

আলোচ্য প্রবন্ধটি লাহোরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাধারণভাবে 'আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের রিপোর্ট' নামে। এবং এটি পুস্তকাকারে উর্দূ ও ইংরেজীতে, কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে **জামাতে আহ্‌মদীয়ার** তরফ থেকে **'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী'** (The Philosophy of the Teachings of Islam) শিরোনামে। এছাড়া এর অনুবাদ ফ্রান্স, ডাচ, স্পেনিশ, আরবী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায়ও ইদানীং প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের উপরে অনেক বড় বড় দার্শনিক এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর সম্পাদকরা সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাও এই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

১. **'দি ব্রীস্টল টাইমস্ এ্যান্ড মিরর'** লিখেছে ঃ নিশ্চয় যে ব্যক্তি এইভাবে ইউরোপ ও আমেরিকাকে সম্বোধন করতে পারেন, তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি হতে পারেন না।'

২. **'দি স্পিরিচুয়াল জার্নাল'** বোস্টন, লিখেছে ঃ 'এই গ্রন্থ মানবজাতির জন্য এক বিশুদ্ধ সুসমাচার।'

৩. **'দি থিওসফিকাল নোট্‌স'** লিখেছে ঃ 'এই কিতাব মুহাম্মদ (সাঃ)- এর ধর্মের উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম চিত্তাকর্ষক চিত্র।'

৪. **'দি ইন্ডিয়ান রিভিউ'** লিখেছে ঃ 'এই গ্রন্থের চিন্তাধারা আলো দ্বারা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং পাঠকের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এর প্রশংসা উচ্চারিত হয়।"

৫. **'দি মুসলিম রিভিউ'** লিখেছে ঃ 'এই গ্রন্থের অধ্যয়নকারী এর মধ্যে অনেক সত্য এবং সূক্ষ্ম এবং অকৃত্রিম এবং জীবন সঞ্চারী চিন্তা-চেতনার সন্ধান পাবে।'

*(দ্রঃ হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রাঃ) রচিত **'সিলসিলায়ে আহমদীয়া'**।)*

এই প্রবন্ধের বিশেষ সৌন্দর্য হচ্ছে, এতে অপর কোন ধর্মের প্রতি কোন আক্রমণ করা হয়নি। বরং, কেবল ইসলামেরই সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা

করা হয়েছে এবং প্রশ্নগুলির উত্তর শুধু কোরআন মজীদ থেকেই দেওয়া হয়েছে। এবং তা সবই এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যার ফলে অন্য সকল ধর্মের উপরে ইসলামের পূর্ণতা, সুন্দরতা এবং উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।*

মাওলানা জালালুদ্দীন শামস
প্রাক্তন মোবাল্লেগ ও ইমাম
লন্ডন মসজিদ

* হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলী - **'রূহানী খাযায়েন'** - ১০ম খন্ড হতে গৃহীত। বঙ্গানুবাদ ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

সত্যান্বেষীগণের জন্য

মহা সুসংবাদ

লাহোর টাউন হলে ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ ইং তারিখে যে ধর্মীয় মহাসম্মেলন হইবে, উহাতে কুরআন শরীফের কামালাত ও মো'জেযাত বা সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে এই অধমের একটি সন্দর্ভ পাঠ করা হইবে। ইহা সেই সন্দর্ভ, যাহা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, খোদার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এবং তাঁহার বিশেষ সাহায্যে লিখিত। ইহাতে কুরআন শরীফের ঐ সব মা'রেফাত বা জ্ঞান ও তত্ত্বাবলী লিখিত হইয়াছে, যদ্বারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে যে, উহা প্রকৃতপক্ষে খোদার কালাম এবং বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্ব-প্রতিপালক রব্বুল আলামীনের গ্রন্থ। যে ব্যক্তি এই সন্দর্ভের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর শুনিবেন, আমি নিশ্চিত যে, তাঁহার মধ্যে এক নূতন ঈমান সৃষ্টি হইবে; এক নূতন আলোক তাঁহার মধ্যে দ্বীপ্ত হইয়া উঠিবে এবং খোদাতা'লার পবিত্র কালামের এক সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ তফ্সীর তাঁহার হস্তগত হইবে। আমার এই বক্তৃতা মানবীয় বৃথা আস্ফালন ও বাগাড়ম্বরের কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে। মানব জাতির জন্য আমার অকৃত্রিম সহানুভূতিই আমাকে এই ইশ্তিহার লিখিতে বাধ্য করিতেছে, যেন তাহারা কুরআন শরীফের হুস্ন ও জামাল, ইহার পরম রূপ ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এবং বুঝিতে পারে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ইহা কত বড় যুলুম যে, তাহারা অন্ধকারকে ভালবাসে এবং আলোকে ঘৃণা করে। আমাকে সর্বজ্ঞ খোদা এলহাম (ঐশী বাণী) মারফৎ জানাইয়াছেন যে, ইহা সেই সন্দর্ভ যাহা সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে এবং ইহার মধ্যে সত্য, হেকমত ও তত্ত্ব-জ্ঞানের এমন অফুরন্ত আলোক আছে যে, যদি অন্য ধর্মের লোকগণ উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত ইহা শ্রবণ করে, তবে নিশ্চয় লজ্জিত হইবে। কেননা, কখনও তাহারা খ্রীষ্টানই হউক, আর্যই হউক, সনাতন ধর্মীই হউক অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক, তাহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে এই সকল মহান তত্ত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করতে পারিবে না। কারণ খোদাতা'লা সংকল্প করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষ্যে এই পবিত্র গ্রন্থের (কুরআনের) জ্যোতির্বিকাশ হইবে। আমি আলমে-কাশ্ফে অর্থাৎ দিব্য-জগতে ইহার সম্বন্ধে দেখিয়াছি যে, আমার বাড়ীতে অদৃশ্য হইতে একটি হস্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং উহার স্পর্শে বাড়ী

হইতে এক উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং আমার হস্তদ্বয়েও উহার আলো পড়িয়াছে। তখন এক ব্যক্তি আমার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَر خَرِبَتْ خَيْبَر

'আল্লাহ্ মহান, খয়বর-এর পতন ঘটিয়াছে,

ইহার তা'বির (ব্যাখ্যা) এই যে, বাড়ী দ্বারা আমার হৃদয়কে বুঝায়, যাহা আলোকরাজি অবতরণ ও বিকীর্ণ হইবার স্থান এবং সেই আলো কুরআনের মারেফাত বা নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান। তারপর, খয়বর দ্বারা সব বিকৃত ধর্ম বুঝায়, যাহার মধ্যে শির্ক ও মিথ্যা মিশ্রিত হইয়াছে এবং মানুষকে খোদার স্থান দেওয়া হইয়াছে বা খোদার গুণাবলীকে উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। অতএব, আমাকে জানান হইয়াছে যে, এই সন্দর্ভ বহুল প্রচারিত হইলে অসত্য ধর্মগুলির অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং কুরআনের সত্যতা দিনে দিনে বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করিবে, যে পর্যন্ত না উহা পূর্ণত্ব লাভ করে। অতঃপর আমার হৃদয়কে কাশ্‌ফী অবস্থা হইতে এলহামের দিকে আনা হইল এবং আমি এলহাম প্রাপ্ত হইলাম ঃ

ان الله معك ان الله يقوم اينما قمت

"খোদা তোমার সঙ্গে আছেন এবং খোদা সেখানেই দাঁড়ান, যেখানে তুমি দাঁড়াও।" ইহা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের রূপক উক্তি। এখন আমি অধিক লিখিতে চাই না। সকলকে ইহা জানাইয়া দিতেছি যে, আপনাদের ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও অবশ্যই এই সকল জ্ঞান-দীপ্ত তত্ত্ব-কথা শ্রবণের জন্য লাহোর সম্মেলনের দিনগুলিতে উপস্থিত হইবেন। সকলের যুক্তি ও বিশ্বাস ইহার দ্বারা এমনভাবে উপকৃত হইবে, যাহা তাঁহারা কখনও কল্পনাও করিতে পারিবে না।

والسلام على من اتبع الهدى

যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, তাহার উপর শান্তি।

কাদিয়ান — খাকসার
২১ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ — গোলাম আহ্‌মদ

(মজ্‌মুয়া ইশ্‌তিহারাত ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৪-৬১৫, রুহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা XVII)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

ইসলাম

দাবী ও দলিল–প্রমাণ ঐশীগ্রন্থ হইতে হওয়া জরুরী

আজ এই মোবারক সম্মেলনে, যাহার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে প্রত্যেক বক্তা বিজ্ঞাপিত প্রশ্নাবলীর সীমার মধ্যে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্মের সৌন্দর্য তুলিয়া ধরিবেন, আমি এতদুপলক্ষ্যে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করিব। আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে একথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা সমীচীন মনে করি যে, আমি যাহা কিছু বলিব খোদাতা'লার **পবিত্র বাণী কুরআন শরীফ** হইতে বলিব। কারণ আমার মতে ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, যিনি যে গ্রন্থের অনুসারী এবং যে গ্রন্থকে তিনি ঐশীবাণী বলিয়া মান্য করেন, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সেই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া উত্তর প্রদান করিবেন এবং তাঁহার ওকালতি ও বক্তব্যের পরিসীমাকে এত প্রশস্ত করিবেন না যে, তিনি যেন এক নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। সুতরাং আজ যেহেতু আমাকে কুরআন শরীফের সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ইহার পূর্ণ গুণাবলী প্রদর্শন করিতে হইবে, সেইজন্য ইহা সংগত যে, আমি কোন বিষয়ে ইহার বর্ণনার বাহিরে যাইব না এবং ইহারই ইঙ্গিত, বা স্পষ্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী এবং ইহারই আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি দিয়া আমার বক্তব্যের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যকে লিখিব, যাহাতে শ্রোতা বা পাঠকের পক্ষে তুলনা ও যাচাই করা সহজ হয়। কারণ যাহারা কোন ঐশী-গ্রন্থের অনুসারী, তাঁহারা আপন আপন ঐশী-গ্রন্থের বর্ণনার অধীনে থাকিয়াই সেই গ্রন্থের উক্তি উপস্থাপন করিবেন। এইজন্য আমি এখানে হাদীসের উল্লেখ ছাড়িয়া দিয়াছি, যদিও সব শুদ্ধ বা সহীহ্ হাদীস কুরআন শরীফেরই অনুসারী। কুরআন শরীফ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, যাহার মধ্যে সকল গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ও শেষ হইয়াছে। বস্তুতঃ আজ কুরআন শরীফের মর্যাদা প্রকাশিত হওয়ার দিন এবং আমরা খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন এই কাজে আমাদের সহায় হন, আমীন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! স্মরণ রাখিবেন যে, এই বিষয় সম্পর্কে প্রথম পৃষ্ঠাগুলিতে ভূমিকারূপে লিখিত কোন কোন কথা আপাতঃ দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও, মূল উত্তর বুঝিবার পক্ষে এইগুলি প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই জরুরী। এই জন্য বিষয়াবলীকে সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, মূল বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে, এই সকল কথা লিখিতে হইল, যাহাতে আসল বিষয় বুঝিতে কষ্ট না হয়।

মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা

প্রথম প্রশ্ন হইল মানুষের স্বভাবজ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানিচয় সম্বন্ধে। খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফ আলোচ্য অবস্থা তিনটির উৎপত্তির তিনটি পৃথক পৃথক উৎস নির্ধারণ করিয়াছে। এইরূপও বলা যাইতে পারে যে, ইহাদের তিনটি উৎস রহিয়াছে, যেগুলি হইতে পৃথক পৃথকভাবে এই তিনটি অবস্থা উৎসারিত হইয়াছে।

প্রথম উৎস

নাফ্‌সে আম্মারাহ্ (অবাধ্য আত্মা)

প্রথম উৎস, যাহা হইতে সকল স্বভাবজাত অবস্থার উৎপত্তি হয়, উহার নাম রাখিয়াছে কুরআন শরীফ **'নাফ্‌সে-আম্মারাহ'**।

যেমন বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ (সূরা ইউসুফ, 12 : 54)

অর্থাৎ নাফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে টানিয়া নামায়, যাহা তাহার পূর্ণতার পরিপন্থী ও তাহার নৈতিক

অবস্থার বিপরীত। ইহা তাহাকে অন্যায় ও অপছন্দনীয় পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে (১২:৫৪)। বস্তুতঃ সীমা লঙ্ঘন ও মন্দ কাজের দিকে যাওয়া মানুষের এক অবস্থা, যাহা নৈতিক অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে স্বভাবতঃ তাহার উপর প্রবল থাকে। এই অবস্থা ঐ সময় পর্যন্ত সহজাত অবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বুদ্ধি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের ছায়ায় চলে; বরং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার, শয়ন, জাগরণ বা ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সে সহজাত বা প্রবৃত্তির অধীন থাকে। মানুষ যখন বুদ্ধি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রেরণায় স্বভাবজ অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করে এবং বাঞ্ছিত সংযমের প্রতি মনোযোগী হয়, তখন এই অবস্থাত্রয়ের নাম দৈহিক স্বভাবজ অবস্থা থাকে না, বরং এই অবস্থা নৈতিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। এ সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা হইবে।

দ্বিতীয় উৎস

নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ (তিরস্কারকারী আত্মা)

নৈতিক অবস্থার উৎসের নাম কুরআন শরীফে **নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্** বলা হইয়াছে। যেমন, খোদাতা'লা বলিয়াছেনঃ

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ (সূরা ক্বিয়ামাহ্, 75 : 3)

অর্থাৎ, "আমি ঐ আত্মার শপথ করিতেছি, যাহা প্রত্যেক অপকর্ম ও সীমা লঙ্ঘনে নিজেকে তিরস্কার করে" (৭৫ : ৩)। এই নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ মানুষের অবস্থাসমূহের দ্বিতীয় উৎস। ইহা হইতে নৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয়। এই পর্যায়ে মানুষ অন্য প্রাণীর সাদৃশ্য হইতে মুক্তি লাভ করে। এ স্থলে নাফ্‌সে লাউওয়ামার শপথ, ইহার সম্মানার্থে করা হইয়াছে। অন্য কথায় সে নাফ্‌সে আম্মারাহ্ বা অবাধ্য আত্মা হইতে নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ বা তিরস্কারকারী আত্মায় পরিণত হওয়ায়, এই উন্নতির ফলে আল্লাহ্ তা'লার নিকট মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া যায়। ইহার নাম **লাউওয়ামাহ্** রাখার কারণ ইহা মানুষকে মন্দ কাজে তিরস্কার করে। এবং ইহা মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়নায় বল্‌গাহীন উটের ন্যায় চলা এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত জীবন যাপন করা হইতে নিবৃত্ত করে। বরং ইহা প্রেরণা দেয় যে, মানুষের

দ্বারা উত্তম অবস্থা ও উত্তম চরিত্রের প্রকাশ হউক এবং মানব জীবনের কোন কাজে যেন কোন প্রকার অমিতাচার প্রকাশ না পায়। প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও বাসনা যেন যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং যেহেতু ইহা অন্যায় আচরণকে তিরস্কার করে সেই জন্য ইহার নাম নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ অর্থাৎ অত্যন্ত তিরস্কারকারী আত্মা। যদিও নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে পছন্দ করে না এবং নিজেকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে, তথাপি সৎকর্ম সাধনে পূর্ণরূপে সক্ষম হয় না। বরং কোনো কোনো সময়ে প্রবৃত্তির উত্তেজনা তাহার উপর প্রবল হইয়া পড়ে। তখন তাহার অধঃপতন ঘটে এবং সে পদস্খলিত হয়। অন্য কথায়, সে এক দুর্বল শিশুর ন্যায় হইয়া থাকে, যে আছাড় খাইতে না চাহিলেও, দুর্বলতাবশতঃ আছাড় খায়। অতঃপর সে স্বীয় দুর্বলতার জন্য অনুতপ্ত হয়। মোট কথা ইহা আত্মার সেই নৈতিক অবস্থা, যে অবস্থায় আত্মা নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ করিতে থাকে এবং অবাধ্যতায় অসন্তোষ বোধ করে, কিন্তু তখনও নাফ্‌সে আম্মারার উপর সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয় না।

তৃতীয় উৎস

নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নাহ্ (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা)

অতঃপর তৃতীয় উৎস, যাহাকে রূহানী অবস্থার মূল উৎস বলা যাইতে পারে, সেই উৎসের নাম কুরআন শরীফে **নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নাহ্** রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۙ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۚ

(সূরা ফজর, 89 : 28-31)

অর্থাৎ, "হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! (যাহা খোদা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে)! তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া আইস। তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং আমার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর" (৮৯ : ২৮-৩১)। ইহা সেই মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থা,

যাহাতে আত্মা যাবতীয় দুর্বলতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয় এবং খোদাতা'লার সহিত নিজেকে এরূপ বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে যে তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। পানি যেমন উপর হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং পরিমাণে প্রচুর ও গতিপথ বাধাশূন্য হইলে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তেমনই উহা খোদার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন, "হে সেই আত্মা, যাহা শান্তি পাইয়াছ! তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" সুতরাং মৃত্যুর পরে নহে, বরং ইহজীবনেই সে এক মহান পরিবর্তন সাধন করে। অন্য স্থানে নহে বরং ইহজীবনেই সে এক বেহেশ্‌ত প্রাপ্ত হয়। এবং এই আয়াতে যেমন লিখিত আছে, তুমি তোমার 'রব্ব্'-এর (প্রতিপালকের) দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তেমনই তখন সে খোদা কর্তৃক প্রতিপালিত হয় এবং খোদার প্রেমই তাহার খাদ্য-স্বরূপ হয় এবং সে এই জীবনদায়িনী প্রস্রবণ হইতে পানি পান করে। এইজন্য সে মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝ (সূরা শাম্‌স, 91 : 10-11)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহ হইতে তাহার আত্মাকে শুদ্ধ করে, সে রক্ষা পায়। সে ধ্বংস হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহে, যাহা আসলে স্বভাবজ আবেগসমূহের অন্তর্গত, নিজ সত্তাকে হারাইয়া ফেলে, সে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে" (৯১ : ১০-১১)।

বস্তুতঃ এই হইল তিনটি অবস্থা, যাহা অন্য কথায় দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে। যেহেতু প্রবৃত্তির উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে প্রবল ও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে এবং অনেক সময় নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার সর্বনাশ সাধন করে, সেহেতু খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থে ইহাকে নাফ্‌সে আম্মারাহ্ বা অবাধ্য আত্মা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মানুষের দৈহিক প্রবৃত্তিসমূহের উপর কুরআন শরীফের প্রতিক্রিয়া কি এবং উহা এ সম্পর্কে কি নির্দেশ দান করে এবং কার্যতঃ কোথায় লইয়া যাইতে চাহে? তাহা হইলে,জানা আবশ্যক, কুরআন শরীফের মতে, মানুষের দৈহিক অবস্থা তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে

সম্পর্কযুক্ত। এমন কি মানুষের পানাহার পদ্ধতিও মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। যদি প্রবৃত্তিগত অবস্থাসমূহকে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে, যেমন কোনো বস্তু লবণের খনিতে পতিত হইলে উহা লবণ হইয়া যায়, তেমনই ঐ সকল অবস্থা নৈতিক অবস্থায় পরিণত হইয়া যায় এবং রূহানীয়তের (আধ্যাত্মিকতার) উপর গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই কারণে কুরআন শরীফ সর্বপ্রকার এবাদতের ক্ষেত্রে, হৃদয়ের পবিত্রতা, ভক্তি ও চিত্ত-বিগলনের উদ্দেশ্যে, দৈহিক পবিত্রতা, দৈহিক আদব এবং সুসঙ্গত দেহ-সঞ্চালনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। গভীর মনযোগ সহকারে চিন্তা করিলে এই দর্শনই অত্যন্ত সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, রূহ্ বা আত্মার উপর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গভীর প্রভাব রহিয়াছে। যেমন, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের স্বভাবজ ক্রিয়া বাহ্যতঃ দৈহিক হইলেও আমাদের আত্মিক অবস্থার উপর উহার নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন আমাদের চক্ষু কাঁদিতে আরম্ভ করে এবং আমরা যদি চেষ্টা করিয়াও কাঁদি, তখন সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুধারা হইতে একটি শোকাগ্নি-শিখা উত্থিত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে নিপতিত হয়। তখন হৃদয়ও চোখের অনুগমনে শোকার্ত হয়। সেইরূপ, যখন আমরা কৃত্রিমভাবে হাসিতে আরম্ভ করি, তখনও হৃদয়ে এক প্রকার প্রফুল্লতা জন্মে। ইহাও দেখা যায় যে, দৈহিক সেজদাও আত্মার মধ্যে একাগ্রতা ও বিনীতভাবের সৃষ্টি করে। ইহার মোকাবিলায়, আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, আমরা ঘাড় উঁচু করিয়া বুক ফুলাইয়া চলিলে, হাঁটার এই ভঙ্গী আমাদের মধ্যে এক প্রকার অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার ভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নিশ্চয় আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গিরও প্রভাব রহিয়াছে।

অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যে, মানসিক এবং আত্মিক শক্তির উপর বিভিন্ন খাদ্যেরও নিশ্চিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা কখনও মাংস খায় না, তাহাদের বীরত্বের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এমন কি, অচিরেই তাহারা অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত হইয়া পড়ে এবং খোদাপ্রদত্ত একটি প্রশংসনীয় শক্তি হারাইয়া ফেলে। ইহার সাক্ষ্য খোদার প্রাকৃতিক বিধানে এইভাবে

পাওয়া যায় যে, চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে তৃণভোজী যতগুলি জন্তু আছে, তাহাদের কোনটিই তেমন সাহসী নহে, যেমন সাহসী মাংসাশী জন্তুরা। পাখীর মধ্যেও ইহাই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নৈতিক জীবনের উপর খাদ্যের ক্রিয়া ও প্রভাব রহিয়াছে। অবশ্য, যাহারা দিনে ও রাতে সব বেলাই মাংস আহারের উপর জোর দেয় এবং শাকসব্জী জাতীয় খাদ্য খুবই অল্প আহার করে, তাহাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও নম্রতার গুণ কমিয়া যায়। যাহারা মধ্যপন্থী, তাহারা উভয় শ্রেণীর গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়। এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا (সূরা আরাফ, 7 : 32)

অর্থাৎ, মাংসও ভোজন করিবে এবং অন্য দ্রব্যও খাইবে, কিন্তু কোন জিনিসের আহারের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করিবে না। যেন উহাতে নৈতিক চরিত্রের উপর মন্দ প্রভাব না পড়ে এবং ইহার আধিক্যের ফলে স্বাস্থ্য হানিও না ঘটে (৭:৩২)। দৈহিক কার্যকলাপের প্রভাব যেমন আত্মার উপর পড়ে, তেমনি আত্মার প্রভাবও দেহের উপর পড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তি শোকার্ত হয়, তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠে এবং যে উৎফুল্ল হয়, তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। আমাদের পানাহার, শয়ন, জাগরণ, শ্রম, বিশ্রাম, স্নানাদি যত প্রকার স্বাভাবিক কাজকর্ম আছে, ইহাদের সবগুলিই নিশ্চিতরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর প্রভাবশীল। আমাদের মানব-প্রকৃতির সহিত আমাদের দৈহিক গঠনের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। মস্তিষ্কের একস্থানে আঘাত লাগিলে, তৎক্ষণাৎ স্মরণ শক্তি লোপ পাইতে থাকে এবং অন্যত্র আঘাত লাগিলে চেতনা ও বোধ-শক্তি লোপ পায়। মহামারীর বিষাক্ত হাওয়া অতি দ্রুত দেহের উপর ক্রিয়া করিয়া মনকে আক্রমণ করে এবং দেখিতে দেখিতে সেই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, যাহার সহিত সকল নৈতিক বিধান সম্পর্কযুক্ত, চুরমার হইতে থাকে। এমন কি মানুষ পাগল-প্রায় হইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করে। বস্তুতঃ দৈহিক আঘাতও আশ্চর্য রকমের অঘটন ঘটায়। এগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা ও দেহের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, এই রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে, ইহার

চাইতে অধিকতর শক্তিশালী দলিল এই যে, মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে বোঝা যায় যে, **দেহই আত্মার জননী**। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের গর্ভে আত্মা উপর হইতে নিপতিত হয় না। বরং উহা এক অলোস্বরূপ, যাহা বীর্যে নিভৃতভাবে গুপ্ত থাকে এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। খোদাতা'লার পবিত্র কালাম (বাক্য) আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, আত্মা এই দেহের মধ্যেই বিকশিত হয়; ইহা বীর্য হইতে মাতৃগর্ভে তৈরী হয়। যেমন, তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝ (সূরা মু'মিনুন, 23 : 15)

অর্থাৎ, "অতঃপর আমরা এই দেহকে, যাহা মাতৃগর্ভে তৈরী হইয়াছিল, আর এক জন্মের রঙে আনয়ন করি এবং উহার মধ্যে আরও এক সৃষ্টির প্রকাশ করি, যাহা আত্মা (রূহ্) নামে অভিহিত হয়। খোদা অনন্ত কল্যাণময় এবং এমনই স্রষ্টা যে, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই"(২৩:১৫)। 'এই দেহের মধ্যে আমরা আর এক সৃষ্টির প্রকাশ করি,' কথাগুলির মধ্যে একগভীর রহস্য রহিয়াছে, যাহা আত্মার প্রকৃত তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং ঐ সকল একান্ত নিবিড় সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাহা আত্মা ও দেহের মধ্যে বিদ্যমান। এই ইঙ্গিত আমাদিগকে এ কথাও শিক্ষা দেয় যে, মানুষের দৈহিক ক্রিয়া ও কথা-বার্তা এবং যাবতীয় স্বভাবজাত কাজকর্ম যখন খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার পথে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন উহার প্রতিও একই ঐশী-দর্শন প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এই সকল **আন্তরিকতাপূর্ণ আমল বা কর্মসমূহেও শুরু হইতেই একটি আত্মা লুক্কায়িত থাকে**, যেভাবে বীর্যে নিহিত ছিল এবং যতই এই সকল আমলের দেহ তৈরী হইতে থাকে, ততই সেই আত্মাও উজ্জ্বলতর হইতে থাকে এবং যখন দেহ সম্পূর্ণ তৈরী হইয়া যায়, তখন সহসা সেই আত্মা ও উহার পূর্ণ জ্যোতির্বিকাশ সহ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং স্বীয় আত্মিক মর্যাদায় নিজ সত্তাকে প্রকাশ করিয়া দেখায়। তখন জীবনের স্পষ্ট স্পন্দন শুরু হইয়া যায়। যখন আমলের পূর্ণ দেহ তৈরী হইয়া যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় একটা জিনিস উহার ভিতর হইতে স্বীয় প্রকাশ্য জ্যোতিঃ বিকাশ

করিতে আরম্ভ করে। ইহা সেই সন্ধিক্ষণ, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে রূপকভাবে বলিয়াছেন ঃ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ○

(সূরা হিজর, 15 : 30)

অর্থাৎ, "যখন আমি উহার কলেবর তৈরী সম্পূর্ণ করিলাম এবং জ্যোতির্বিকাশের সকল ব্যবস্থাপনাকে সুসম্পন্ন করিলাম এবং আমার রূহ্ উহার মধ্যে ফুঁকিয়া দিলাম, তখন তোমরা **সমগ্র মানবমণ্ডলী** উহার জন্য ভূমির উপর সিজদায় প্রণত হও" (১৫:৩০)। সুতরাং এই আয়াতে এই ইশারাই রহিয়াছে যে, আমলের সম্পূর্ণ কলেবর যখন তৈরী হইয়া যায়, তখন উহার মধ্যে সেই রূহ্ উদ্দীপিত হইয়া উঠে, যাহাকে খোদাতা'লা আপন সত্তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন। কারণ পার্থিব জীবনের বাসনা কামনাকে বিলীন করিয়া দেবার পর, সেই অবয়ব তৈরী হয়। এইজন্য ঐশী আলো, যাহা মৃদু ছিল, হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে। তখন ইহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে যে, খোদার এহেন মহিমা দর্শনে যেন সকলেই সিজদা করে এবং তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং সকলেই এই জ্যোতিঃ দর্শনে সিজদা করে এবং স্বভাবের টানে উহার দিকে অগ্রসর হয়, কেবল মাত্র ইবলীস ছাড়া, যে অন্ধকারকেই ভালবাসে।

★এখানে আর একটি রহস্য বর্ণনা করা অলাভজনক হইবে না আর তা হল মাতৃগর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয় সে চার মাস দশ দিন পর নড়াচড়া করে আর এই সময়কালটি সেই সময় হইতে অর্ধেক হইয়া থাকে যে সময় অবধি শিশুটি মাতৃগর্ভের গোপন প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করে। অতএব যেরূপে জনীন অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান চার মাস দশ দিন পর তার জীবনের অনন্য সাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করে আর বনস্পতি রূপ থেকে প্রাণীরূপে পরিবর্তিত হয়,তদরূপ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও আধ্যাত্মিক সৃষ্টির মধ্যে

★ এই চিহ্ন থেকে শুরু করে পৃষ্ঠা ২৯ র ★ চিহ্ন অবধি অংশটি মূল সন্ধর্ভে বিদ্যমান। যা রিপোর্ট এবং প্রথম সংস্করণে লেখা থেকে রয়ে গিয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে এটা হজরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.) র অনুমতিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। (প্রকাশক- কাদিয়ান)

পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ যে ভাবে জনীন গর্ভাশয়ের একান্তবাসে আন্তরিক অবস্থানের প্রায় অর্ধেক সময় অতিবাহিত করতঃ জীবনের লক্ষণাবলী প্রকট করে এবং জীবনের পূর্ণ ঝলক প্রদর্শন করে তদরূপ একই অবস্থা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যও প্রযোজ্য। মানবের উত্তম জীবন যা কিনা ইন্দ্রিয়গুলির ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পবিত্র, অধিকাংশ লোককে দৃষ্টিগোচরে রেখে তা আশি বছর অবধি (নির্ধারণ করা) হয়ে থাকে আর আশির অর্ধেক চল্লিশ হয়ে থাকে। যা আসলে চার শব্দের সাথে খুবই সাঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ এই চার মাসের সাথে যার গণনা সমাপ্ত হয়ে গর্ভস্থ সন্তান রূহ (আত্মা) লাভ করে। অতএব সঠিক পর্যবেক্ষন প্রমাণ করে যে যখন মানুষ তার উত্তম জীবনের অর্ধেক অংশ অর্থাৎ চল্লিশ বছর যা গর্ভাশয়ে চার মাসের সমতুল্য অতিক্রম করে বা তার শিরোভাগে পৌছে, তখন যদি তার স্বভাবের মধ্যে সত্যের রূহ সৃষ্টি থাকে তখন সেই রূহ সেই বিশেষ সময়ে এসে আপন সুস্পষ্ট লক্ষণাবলী প্রদর্শন করে এবং গতিময় হওয়া শুরু করে। এ কথা কারও উপর গুপ্ত নয় যে চল্লিশ বছরের পূর্ব অবধি অধিকাংশ মানুষের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজমান থাকে। কেননা সাত-আট বছর তো কৈশোরেই অতিবাহিত হয়। অতঃপর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর তো শিক্ষার্জনে নিমগ্ন থাকে অথবা খেলাধূলাতে সময় নষ্ট করে। তৎপশ্চাত বৈবাহিক কারণবশত অথবা স্ত্রী তথা সন্তানাদি হওয়ার ফলে অথবা স্বাভাবিক কোন কারণে সাংসারিক ইচ্ছাদি তার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। সাংসারিক ধন সম্পত্তি এবং সম্মানাদি অর্জনের নিমিত্তে নানাপ্রকার ইচ্ছা এবং উদ্দীপনা তাহার মধ্যে জাগ্রত হয় এবং আনন্দপ্রাপ্তির চিন্তা ধারা চরম পর্যায় অবধি পৌঁছায়। আর যদি সে খোদাতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনও করে সেক্ষেত্রে জাগতিক কামনা-বাসনা একটা পর্যায় অবধি তন্মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকে। আর যদি দোয়াও করে তবে জাগতিক স্বার্থচরিতার্থে অধিক করে থাকে। আর যদি বিলাপও করে তবে তন্মধ্যেও কিছু প্রার্থিব কামনা সুপ্ত থাকে। আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান খুব দুর্বল হইয়া থাকে। আর যদি থাকেও তবে মৃত্যুর এখনো সুদীর্ঘ সময় অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে করা হয়। আর যেরূপে নদীবাঁধ বিপর্যস্ত হইয়া আশে পাশের এলাকাগুলিকে ধ্বংস করিতে থাকে সেইরূপে কামপ্রবৃত্তির বন্যা

মানবীয় চিন্তা চেতনাগুলিকে খুবই সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এমতাবস্থায় সে আখেরাতের সূক্ষ্য সূক্ষ্য তত্ত্বগুলিকে কিভাবে স্বীকার করিতে পারে। উপরন্তু সে ধার্মিক কথাবার্তায় হাঁসি বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করে। আর আপন শুষ্ক যুক্তি এবং নিরর্থক দর্শনশাস্ত্র তুলে ধরে। হ্যাঁ যদি স্বভাবেও পূন্যবাণ হয়ে থাকে তবে খোদাকেও মান্য করে কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সাথে নয়। বরং শুধুমাত্র আপন সফলতার শর্তের সাথে,যদি সাংসারিক মনোবাঞ্ছা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তবেই খোদাতা'লার নয়ত শয়তানের।

মোটকথা যৌবনকালের এই অবস্থা খুবই গম্ভীর স্থিতির হইয়া থাকে। আর যদি ঐশীকৃপা না থাকে তবে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হয়। প্রকৃত সত্য এটাই যে এই বয়সটাই হল সমস্ত ক্রটির মূল। এই বয়সেই মানুষ অধিকতর শারীরিক রোগ এবং গুপ্ত রোগ ক্রয় করিয়া ফেলে। অল্পবয়সের এই ভ্রান্তির কারনে প্রায়শই সত্য এবং অপরিবর্তনশীল খোদা হইতে সে বিমূখ হইয়া যায়। মোটকথা এই সেই বয়স যখন খোদাভীতি কম এবং কামবাসনা ও মনোবৃত্তির প্রভুত্ব হয়ে থাকে। আর কোন উপদেশ প্রদানকারীর উপদেশকে সে গ্রাহ্য করে না। এই বয়সেরই ভুল ভ্রান্তিকে তাহাকে সারা জীবন বহন করিয়া বেড়াতে হয়। পরিশেষে যখন চল্লিশ বছরে পদার্পন করে তখন যৌবনের ডানা-পাখনা একটু একটু করে ঝরিতে আরম্ভ করে। তখন আপনিই সেই সব কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়,যেগুলির উপর একদা উপদেশ প্রদানকারীরা মাথা ঘামিয়েছিল। পরিশেষে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মনের আবেগ কম হইয়া আসে। কেননা শারীরিক অবস্থার দৃষ্টিকোন থেকে আয়ুক্ষয়ের যুগও তখন শুরু হইয়া যায়। সেই উত্তেজনাপূর্ণ রক্ত এখন কোথায় তৈরী হইবে যা পূর্বে সৃষ্টি হইত। সেই বাহুশক্তি এবং যৌবনের সেই উদ্দীপনা এখন কোথায় অবশিষ্ট থাকিবে যাহা পূর্বে থাকিত? এখন তো পতন এবং লোকসানের সময় এসে উপস্থিত। তদুপরি ক্রমাগত সেইসব বুজুর্গদের তিরোধান প্রত্যক্ষ করিতে হয় যাহারা তাহার অপেক্ষা বয়সের ভারে জর্জরিত ছিল। অনেকসময় আবার প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী ছোটদের মৃত্যুও কোমর ভেঙ্গে দেয়। আর সম্ভবত এই বয়সেই পিতা মাতাও কবরস্থ হইয়া

যায়। এবং সংসারের অস্থায়ী হওয়ারও বহু লক্ষন প্রকট হইতে থাকে। আর খোদাতা'লা তাহার সম্মুখে একটি দর্পন তুলিয়া ধরেন যে, লক্ষ্য কর, সংসারের অবস্থা এরূপ আর যাহার জন্য তুমি দিনপাত করিতেছ তার পরিণতি এই। তখন সে তাহার অতীত কৃতকর্মগুলিকে উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করে। আর যদি সে পবিত্রচেতা এবং তাহাদের অন্তর্গত হয় যাহাদেরকে আহ্বান করা হইয়াছে তবে একটি মহাবিপ্লব তাহার উপর আপতিত হয়। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্তা'লা বলেছেন ,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ
رَبِّ اَوْزِعْنِۤىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(সূরা আল্ আহ্কাফ 46: 16)

অর্থাৎ আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি। দেখ তোমার মাতা তোমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছে। সে তোমার গর্ভস্থ হওয়ার কারনে একটা লম্বা সময় অবধি কষ্ট স্বীকার করেছে। এবং তোমাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে। এবং তোমাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও দুধ ছাড়াইতে ত্রিশ মাস অবধি সে কষ্ট স্বীকার করেছে। অতঃপর বলেন, যখন নেক মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করে এবং পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় ,তখন তার খোদাতা'লার ওসীয়্যাত স্মরণে আসে। সে বলে,'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দান কর,যাহাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি যাহা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করিয়াছ এবং তওফীক দাও যেন আমি এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধ্যেও পূণ্য প্রতিষ্ঠিত কর। অর্থাৎ যদি আমি মাতা-পিতার পক্ষ থেকে ভুল ত্রুটি করে বসি তবে এমনটা যেন না

হয় যে তারাও এমনটা করবে। আর যদি আমার উপর কষ্টের সময় এসে থাকে তবে তাদের উপর যেন এমনটা কখনও না আসে। হে আমার খোদা এখন আমি নিশ্চয় তোমার সমীপে অবনত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অর্ন্তভুক্ত। অতএব খোদাতা'লা এই আয়াতে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে,নেক বান্দাদের উপর চল্লিশতম বর্ষ খুবই পবিত্রময়। যার মধ্যে সত্যের রূহ থাকে তা অবশ্যই চল্লিশতম বর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। খোদাতা'লার অধিকাংশ সম্মানিত নবীও এই চল্লিশ বছরে আবির্ভূত হয়েছেন। সেইমত আমাদের নেতা ও প্রভূ হজরত মহম্মদ মোস্তফা (সা.)চল্লিশ বছর বয়সেই সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন।★

আত্মার সৃষ্টি হওয়া বিষয়ে

আবার আমি প্রথম কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। ইহা একান্ত সঠিক ও সত্য যে, আত্মা এক সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ, যাহা এই দেহাভ্যন্তরেই জন্মে এবং মাতৃগর্ভে প্রতিপালিত হয়। জন্মিবার অর্থ এই যে, প্রথমে গুপ্ত থাকে এবং অনুভূত হয় না। পরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। গোড়া হইতে ইহার উপাদান বীর্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। নিঃসন্দেহে উহা স্বর্গের খোদার অভিপ্রায়ে, তাঁহার অনুমতিতে ও তাঁহার ইচ্ছায় এক অজ্ঞাত অবস্থায় রহস্যাবৃতভাবে বীর্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। ইহা বীর্যের এক উজ্জ্বল আলোকময় অবস্থা। আমি বলিতে পারি না, ইহা বীর্যের সেইরূপ অংশ, যেরূপ প্রত্যঙ্গ দেহের অংশ। কিন্তু ইহাও আমি বলিতে পারি না যে, ইহা বাহির হইতে আসে বা ভূমিতে পতিত হইয়া বীর্যের মূল ধাতুর সহিত মিশ্রিত হয়। বরং ইহা বীর্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, যেমন পাথরে আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে। খোদার কেতাব ইহার সমর্থন করে না যে, আত্মা স্বতন্ত্রভাবে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় বা নভোমন্ডল হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হয় এবং দৈবক্রমে বীর্যের সহিত মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। বরং এই ধারণা কোন মতেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যদি আমরা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হই, তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদিগকে

ভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। আমরা রোজ প্রত্যক্ষ করি যে, বাসী ও পচা খাদ্য দ্রব্য এবং পচা জখমে সহস্র সহস্র জীবাণু জন্মে; ময়লা কাপড়ে শত শত উকুন হয়। মানুষের পেটেও ক্রিমি জন্মে। আমরা কি বলতে পারি যে, এসব বাহির হইতে আসে বা আকাশ হইতে কেহ ইহাদিগকে নিক্ষেপ করে? সুতরাং সত্য কথা এই যে, আত্মা দেহ হইতেই উদ্‌গত হয় এবং এই প্রমাণ দ্বারা ইহার সৃষ্টি হওয়া সাব্যস্ত হয়।

আত্মার দ্বিতীয় জন্ম

এখন আমরা বলিতে চাই, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁহার অপার মহিমায় আত্মাকে দেহ হইতে উদ্গত করেন, তাঁহার অভিপ্রায় ইহাই ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, আত্মার দ্বিতীয় জন্মও দেহের মাধ্যমেই প্রকাশিত হউক। আত্মার স্পন্দন আমাদের দেহের স্পন্দনের উপর নির্ভরশীল। যে দিকে আমরা দেহ সঞ্চালিত করি, আত্মাও সেই দিকে নিশ্চিতভাবে পশ্চাদানুসরণ করিয়া চলে। এজন্য মানুষের স্বভাবজ অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া খোদাতা'লার সত্য গ্রন্থের কাজ। এই কারণেই কুরআন শরীফে মানুষের স্বভাবজ অবস্থার ইস্‌লাহের (সংশোধনের) জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। মানুষের হাসি-কান্না, পানাহার, শয়ন, কথা বলা, চুপ থাকা, বিবাহ করা, কৌমার্য অবলম্বন করা, চলা ফেরা, অবস্থান করা, বাহ্যিক পবিত্রতা ও স্নানাদির শর্ত পালন করা, স্বাস্থ্যের বিধান মান্য করা, অসুস্থ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করা, এই সকল বিষয়ের নির্দেশ কুরআন শরীফে লিখিত আছে; এবং মানুষের দৈহিক অবস্থা আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া উহা নির্ধারিত করিয়াছে। এই সমুদয় নির্দেশ বিস্তারিতভাবে লেখা হইলে, আমার মনে হয় না যে, এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।

মানুষের ক্রমাগত উন্নতি

আমি যখন খোদার পবিত্র বিধান নিয়া চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার শিক্ষায়, প্রথমে মানুষের দৈহিক ও স্বাভাবিক অবস্থার সংস্কারের বিধান প্রদান করিয়া, পরে তাহাকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব দিকে

আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন। এই জ্ঞানগর্ভ বিধান দেখিয়া আমার মনে হয় যে, প্রথমে খোদা চাহিয়াছেন, মানুষকে উঠা-বসা, পানাহার, কথাবার্তা এবং সামাজিক জীবন যাপনের সর্বপ্রকার নিয়ম শিক্ষা দিয়া, তাহাকে অসভ্য আচরণ হইতে মুক্তি দান করেন এবং পশু সদৃশ অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিয়া লইয়া, নিম্ন পর্যায়ের এক নৈতিক অবস্থা শিক্ষা দেন, যাহা আদব ও শিষ্টাচার নামে অভিহিত হওয়ার উপযোগী। তারপর, মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাসকে, অন্য কথায় যাহাকে নিম্নস্তরের চরিত্র বলা যাইতে পারে, সুষ্ঠ অবস্থায় আনেন, যাহাতে উহা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসামঞ্জস্য হইয়া উন্নত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই উভয় পন্থাই প্রকৃতপক্ষে এক। কারণ উহা প্রকৃতগত অবস্থার ইস্‌লাহ্ (সংশোধন) মাত্র। শুধু উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের পার্থক্য ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এবং সেই পরম প্রজ্ঞাময় খোদা, নৈতিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে পেশ করিয়াছেন যে, তদ্বারা মানুষ চরিত্রের সর্বনিম্ন স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নতি লাভ করিতে পারে।

ইসলামের সত্যতা

তারপর, তৃতীয় পর্যায়ে উন্নতির জন্য এই অবস্থা করা হইয়াছে যে, মানুষ তাহার স্রষ্টার প্রেম ও সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যাইবে এবং তাহার সমস্ত অস্তিত্ব খোদার জন্য হইয়া যাইবে। এই সেই মর্যাদা, যাহা স্মরণ করাইতে মুসলমানদের ধর্মের নাম **ইসলাম** রাখা হইয়াছে। কারণ, ইসলামের অর্থ এই যে, সম্পূর্ণভাবে খোদার হইয়া যাওয়া এবং নিজের বলিতে কিছুই বাকী না রাখা। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু বলিয়াছেনঃ

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(সূরা বাকারা, 2 : 113)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

(সূরা আনআ'ম, 6 : 163-164)

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ

(সূরা আনআ'ম, 6 : 154)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

(সূরা আলে-ইমরান, 3 : 32)

অর্থাৎ "মুক্তি প্রাপ্ত সেই, যে তাহার অস্তিত্বকে খোদার জন্য বিলীনকরিয়া দেয় এবং খোদার পথে কুরবানীস্বরূপ রাখিয়া দেয়। শুধু নিয়্যত দ্বারাই নহে, বরং সৎকর্ম দ্বারাও তাহার প্রতিদান খোদার নিকট নির্ধারিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা শোকার্ত হইবে না (২ঃ১১৩)। বল,আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই সেই খোদার জন্য, যাঁহার রবুবিয়্যত (প্রতিপালনকারী গুণ) সকল বস্তুকেই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোন বস্তু এবং কোন ব্যক্তি তাঁহার অংশীদার নহে। আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে, আমি যেন ইহাই করি এবং ইসলামে যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হই অর্থাৎ খোদার পথে আপন অস্তিত্বকে কুরবানী করিতে সকলের অগ্রণী হই (৬ঃ ১৬৩-১৬৪)। ইহাই আমার পথ। অতএব, আইস আমার পথ অবলম্বন কর। ইহার বিরোধী কোন পথ অবলম্বন করিও না। অন্যথায়, খোদা হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে (৬ঃ১৫৪)। জনগণকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস, তবে আইস আমার অনুগমন কর এবং আমার পথে চল, যেন খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৩ঃ৩২)।"

স্বভাবজ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য

এখন আমরা মানুষের এই তিন স্তরের বা অবস্থার পৃথক পৃথক আলোচনা করিব। কিন্তু প্রথমে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, স্বভাবজ অবস্থা, যাহার উৎস নাফ্সে আম্মারাহ্, তাহা খোদাতা'লার পবিত্র কালামের ইঙ্গিত অনুযায়ী নৈতিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। কারণ, খোদার পবিত্র কালাম যাবতীয় স্বভাবজ বৃত্তিসমূহ এবং দৈহিক বাসনা-কামনাসমূহকে স্বভাবজ অবস্থার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। এই

বৃত্তিগুলি যখন সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাল ও পাত্র অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়, তখন উহারা উত্তম নৈতিক চরিত্রে পরিণত হয়। তেমনি নৈতিক অবস্থা আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে ভিন্ন কিছু নহে, বরং ঐ সমস্ত নৈতিক অবস্থাই পূর্ণ মাত্রায় ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্তে বিলীন হওয়া), তাযকিয়ায়ে নফ্স (আত্মশুদ্ধি), এনকেতা-ইলাল্লাহ্ (সংসার-বিমুখ হইয়া আল্লাহ্মুখী হওয়া) পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ আত্মবিলীনতা, পূর্ণ স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং আল্লাহ্ তা'লার সহিত পূর্ণ সখ্য স্থাপন দ্বারা রূহানী রূপ গ্রহণ করে। স্বভাবজ অবস্থা যে পর্যন্ত নৈতিক অবস্থায় পরিণত না হয়, মানুষ কিছুতেই প্রশংসার যোগ্য হয় না। কারণ উহা অন্য প্রাণী এমনকি অচেতন পদার্থেও পাওয়া যায়। শুধু নৈতিকতা অর্জন দ্বারাও মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে পারে না। বরং কোন ব্যক্তি খোদাতা'লার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শন করিতে পারে। চিত্তের নম্রতা, সহিষ্ণুতা, শান্তি-প্রিয়তা, অনিষ্টকারিতা পরিহার, দুষ্টের মোকাবিলাতে না আসা, এই সব স্বভাবজ অবস্থা, এবং এমন বিষয় যাহা এমন অযোগ্য ব্যক্তির মধ্যেও থাকিতে পারে, যে মুক্তির মূল উৎস হইতে বঞ্চিত এবং প্রকৃত মুক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অনেক চতুষ্পদ জন্তুকে নিরীহ দেখা যায়। লালিত পালিত হইলে তাহারা শান্তস্বভাব দেখায়। এমন কি তাহাদিগকে চাবুকের পর চাবুক মারিলেও তাহারা প্রতিরোধ করে না। এই সব স্বভাবের অধিকারী হওয়ার কারণে, তাহাদিগকে উন্নত মানুষ বলা তো দূরের কথা, মানুষ নামেও আখ্যায়িত করা যায় না। অনুরূপভাবে মন্দ হইতে মন্দতর বিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তি, বরং কোন কোন জঘন্য কুক্রিয়াশীল ব্যক্তিও উক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারে।

জীব হত্যার অপবাদ খণ্ডন

ইহা সম্ভবপর যে, মানুষ দয়ার এমন সীমানায় পৌঁছাইতে পারে যে, যদি তাহার নিজের জখমে পোকা জন্মায়, তবু উহাদেরকে হত্যা করা পছন্দ করিবে না এবং জীবের প্রতি এরূপ মমতাশীল হইতে পারে যে, তাহার মাথার উকুন, বা পাকাশয়ে, অন্ত্রে এবং মস্তিষ্কে যে সকল ক্রিমি বা জীবাণু জন্মে উহাদিগকেও কষ্ট দিতে চাহিবে না। বরং আমি

ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, কাহারও দয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে যে, সে মধু পান ত্যাগ করিয়া দিবে। কারণ অনেক প্রাণী নাশ করিবার পর এবং বেচারী মধু মক্ষিকাসমূহকে স্থানচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত করিবার পর মধু পাওয়া যায়। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, কেহ মৃগ-নাভির ব্যবহারও এই জন্য ত্যাগ করিতে পারে যে, উহা অসহায় হরিণীর রক্ত ঝরাইয়া এবং বেচারীকে হত্যা করিয়া উহার শাবক হইতে বিচ্ছিন্ন করার পর সংগ্রহ করা হয়। তেমনি আমি ইহাও অস্বীকার করি না যে, কেহ মুক্তা ব্যবহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করা ছাড়িয়া দিবে, কারণ এই উভয় বস্তুই নিরীহ কীটসমূহকে হত্যা করিয়া পাওয়া যায়। বরং আমি ইহাও মানিতে প্রস্তুত যে, কেহ ক্লেশের সময় জোঁক লাগানো হইতে বিরত থাকিবে, এবং নিজে দুঃখ সহ্য করিবে, তবু বেচারা জোঁকের মৃত্যু কামনা করিবে না। পরিশেষে, কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি স্বীকার করি যে, কেহ দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পানি পান করাও পরিত্যাগ করিতে পারে এবং এইভাবে পানির মধ্যে অবস্থিত জীবাণুসমূহকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজে মৃত্যুবরণ করিতে পারে। আমি এ সবই স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমি কখনও ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, এইসব স্বভাবজ অবস্থা নৈতিকতা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, কিংবা শুধু এইগুলি দ্বারা চিত্তের সমস্ত ময়লাই ধৌত হইতে পারে, যাহার বিদ্যমানতা খোদা-মিলনের পরিপন্থী। আমি কখনও ইহা বিশ্বাস করিব না যে, এই প্রকার নিরীহভাব এবং অন্যের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত থাকার দিক হইতে কোনো কোনো চতুষ্পদ জন্তু এবং পাখিকে হার মানাইলেও এগুলি উচ্চাঙ্গের মানবতা অর্জনে সাহায্য করিতে পারে। বরং আমার মতে ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল। যে সকল উচ্চ নৈতিক গুণাবলী আল্লাহ্ তা'লার 'রেযা' বা সন্তুষ্টি লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন, সেগুলির সাথে ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। ইহা বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে অস্বীকার করার শামিল। প্রকৃত রূহানিয়াৎ (আধ্যাত্মিকতা), প্রত্যেক নৈতিক গুণকে স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

খোদাতা'লার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত চলিয়া, তাঁহারই হইয়া যাওয়ার ফলে আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এইভাবে তাঁহারই হইয়া যায়, সে তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণই করিতে পারে না। তত্ত্বদর্শী মানব বা আরেফ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হাতে উৎসর্গীত এক মৎস্য বিশেষ, আল্লাহ্‌র ভালবাসার পানিই তাহার জীবিকা।

ইস্‌লাহের (সংশোধনের) তিনটি পদ্ধতি

এখন আমি পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমি বলিয়াছি যে, মানুষের অবস্থাসমূহের মূল উৎস তিনটি। অর্থাৎ, 'নাফ্‌সে আম্মারাহ্' (অবাধ্য আত্মা), নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ (তিরস্কারকারী আত্মা) এবং নাফ্‌সে মুৎমাইন্নাহ্ (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা) এবং ইসলাহ্ বা শুদ্ধির পথও তিনটি। প্রথমতঃ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অসভ্য মানুষকে নিম্ন স্তরের নীতির উপর কায়েম করিতে হইবে, যেন সে পানাহার এবং বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে মানবোচিত নিয়মে চলে। সে উলঙ্গ বিচরণ করিবে না; কুকুরের মত মৃত খাইবে না এবং অন্য কোন প্রকার অনাচার করিবে না। প্রবৃত্তির সংস্কার কার্যে ইহা সর্ব নিম্ন স্তরের ইসলাহ্। ইহা এই প্রকারের ইসলাহ্ যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পোর্ট ব্লেয়ারের জংলী মানুষের মধ্যে কাহাকেও মানবতার প্রয়োজনীয় উপাদান শিক্ষা দিতে হইলে, প্রথমে ছোটখাট মানবোচিত নীতি এবং শিষ্টাচারের পন্থা শিক্ষা দিতে হইবে।

ইস্‌লাহের দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মানবতার সাধারণ বাহ্যিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাকে মানবতার উন্নতমানের নীতিসমূহ শিক্ষা দিতে হইবে এবং মানুষের বৃত্তি সমূহে নিহিত শক্তিসমূহকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও সময়ে ব্যবহার করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।

তৃতীয় পর্যায়ে সংস্কার সাধনের পন্থা এই যে, যাহারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইয়া সাধু সাধকের মত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রেম সুধা এবং ঐশী মিলনের স্বাদ গ্রহণ করাইতে হইবে। ইসলাহের এই তিন পন্থাই কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

ইস্‌লাহের চরম প্রয়োজনের সময়ে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব

আমাদের নেতা ও প্রভু নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এমন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যখন পৃথিবী সকল দিক হইতেই খারাপ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (সূরা রূম, 30 : 42)

অর্থাৎ, "জঙ্গলও বিগড়াইয়াছে, দরিয়াও বিগড়াইয়াছে" (৩০ঃ৪২)। একথা ইংগিত করিতেছে যে, যাহারা গ্রন্থধারী বলিয়া দাবী করে, তাহারাও বিকৃত হইয়াছে এবং অন্য সব মানুষ, যাহারা ঐশী বারিধারা লাভ করে নাই, তাহারাও বিকৃত হইয়াছে। সুতরাং কুরআনের কাজ ছিল মূলতঃ মৃতদিগকে জীবিত করা। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেনঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ (সূরা হাদীদ, 57 : 18)

অর্থাৎ, "অবহিত হও, এখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর নতুনভাবে জীবিত করিতে চলিয়াছেন"(৫৭ঃ১৮)। ঐ সময়ে আরবের অবস্থা বর্বরতার নিম্নতম স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। মানবতার কোন লক্ষণই তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। সকল প্রকারের পাপ তাহাদের দৃষ্টিতে শ্লাঘার বিষয় ছিল। এক এক ব্যক্তি শত শত বিবাহ করিত। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ তাহাদের নিকট শিকারের খাদ্যের ন্যায় ছিল। মাতার সহিত বিবাহ বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লাকে বলিতে হইয়াছিলঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ (সূরা নিসা, 4 : 24)

অর্থাৎ, "আজ তোমাদের মাতাদিগকে তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইল" (৪ঃ২৪)। অনুরূপভাবে তাহারা মৃতদেহ ভক্ষণ করিত এবং মানুষের মাংস খাইত। পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নাই, যাহা তাহারা করিত না! অধিকাংশ ব্যক্তি পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খোদার অস্তিত্বও স্বীকার করিত না। কন্যাদিগকে স্বহস্তে হত্যা

করিত। এতিমদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিত। যদিও তাহারা দেখিতে মানুষ ছিল, তথাপি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। তাহাদের লজ্জা-শরম ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল না। তাহারা পানির ন্যায় মদ্য পান করিত। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাভিচারী ব্যক্তি জাতির প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। অজ্ঞতা এত অধিক ছিল যে, চারিদিকের সকল জাতি তাহাদের নাম 'উম্মি' (নিরক্ষর) রাখিয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে এবং এই প্রকারের জাতিসমূহের ইসলাহের জন্য আমাদের নেতা ও প্রভু নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কা শহরে আবির্ভূত হন। অতএব, যে তিন প্রকার শুদ্ধির কথা আমি বলিয়া আসিলাম, এগুলির পকৃত প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই কারণেই কুরআন শরীফ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের তুলনায় পূর্ণাঙ্গীন ও সমগ্র হওয়ার দাবী করে। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠস্থ অন্য কোন ধর্ম পুস্তকই এই ত্রিবিধ সংস্কার সাধনের সুযোগ পায় নাই। কেবল কুরআন শরীফেরই এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে পশুর স্তর হইতে মানুষের স্তরে উন্নীত করা, মানুষকে নৈতিক মানুষে উন্নীত করা এবং নৈতিক মানুষকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষ করা। এই জন্য কুরআন শরীফ এই তিনটি বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ।

কুরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ইস্‌লাহ (সংশোধন) সাধন ঃ

স্বভাবজ অবস্থার ইসলাহের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমি ইহারও আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি যে, কুরআন শরীফে এমন কোন শিক্ষা নাই, যাহা বাধ্য হইয়া অতিকষ্টে মানিতে হয়। কুরআনের উদ্দেশ্য শুধু ত্রিবিধ সংস্কার। ইহা সকল শিক্ষার সার। অবশিষ্ট যাবতীয় আদেশ এই তিন প্রকার সংস্কারের জন্য উপাদানস্বরূপ। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডাক্তারকে কখনও কখনও অস্ত্রোপচার করিতে হয়, আবার কখনও মলম লাগাইতে হয়; তেমনি কুরআনের শিক্ষা মানুষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া এই সব উপাদানকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। ইহার বর্ণিত যাবতীয় তত্ত্ব, যাবতীয় জ্ঞান ও দর্শন এবং উপদেশ

ও নির্দেশাবলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে স্বভাবজ অবস্থা হইতে, যাহার মধ্যে বর্বরতার রং রহিয়াছে, তাহা নৈতিক অবস্থায় উন্নত করা এবং নৈতিক অবস্থা হইতে আধ্যাত্মিকতার সীমাহীন সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া।

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বভাবজ অবস্থাকে নৈতিকতায় রূপ দান

ইতিপূর্বে আমি বলিয়া আসিয়াছি, স্বভাবজ অবস্থা নৈতিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে, বরং ইহা সেই অবস্থা, যাহা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথাক্ষেত্রে, যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে এবং যুক্তি ও বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিলে, নৈতিক অবস্থার রূপ ধারণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বভাবজ অবস্থা, বিচারবুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা যে কোনো চরিত্রের সাদৃশ্য রাখুক না কেন, উহা নৈতিক চরিত্র নহে। বরং যেমন প্রভুর প্রতি কোন কুকুরের বা ছাগলের ভালবাসা ও নম্রতা দেখিয়া আমরা সেই কুকুর কে ভদ্র বলি না এবং ছাগলকেও সদাচারী আখ্যা দিই না, তেমনিভাবে এক ভল্লুক বা ব্যাঘ্রকে উহাদের হিংস্রতার জন্য অশিষ্ট বলি না। আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনাপূর্বক যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি ও বিবেক খাটাইয়া করা না হইলে, সেই কাজ নৈতিকতার আওতায় পড়ে না বা ঐ কাজকে নৈতিক কাজ বলা যায় না। যে ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধি ও উপায় অবলম্বন না করিয়া কাজ করে, সে যথোচিত দুগ্ধ-পোষ্য সেই শিশুর ন্যায়; যাহার মন ও মস্তিষ্কের উপর এখনও বুদ্ধি বা যুক্তির ছায়াপাত হয় নাই; বা সে উন্মাদের ন্যায়, যে তাহার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখা যায় যে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ও পাগল কোনো কোনো সময় এমন আচার-ব্যবহার করে, যাহা শিষ্টাচারের অনুরূপ। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার নাম শিষ্টাচার রাখিবে না। কারণ এই প্রকারের ক্রিয়া বিবেচনা ও ক্ষেত্রজ্ঞানের প্রস্রবণ হইতে নির্গত হয় না, বরং সহজাত প্রবৃত্তির গতিধারায় প্রকাশিত হয়; যেমন মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃস্তনের দিকে তাহার মুখ বাড়ায়, মুরগীর বাচ্চা জন্মিয়াই শস্য-কণা ঠোকরাইয়া খাইবার জন্য দৌড়ায়। জোঁকের বাচ্চার মধ্যে জোঁকের স্বভাব নিহিত থাকে, সাপের

বাচ্চা সাপের স্বভাব প্রকাশ করে এবং ব্যাঘ্র শাবক ব্যাঘ্রের প্রকৃতি প্রদর্শন করে। অতএব মানব শিশুর প্রতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখা কর্তব্য যে, সে জন্মিবামাত্র কীভাবে মানুষের স্বভাব দেখাইতে আরম্ভ করে। তারপর তাহার বয়স এক বৎসর দেড় বৎসর হইলে, তাহার মধ্যে সহজাতস্বভাব বেশী স্পষ্ট হইয়া ওঠে। দৃষ্টান্তস্থলে, সে পূর্বে যেভাবে কাঁদিত, এখন তাহার ক্রন্দন পূর্বাপেক্ষা কতকটা উচ্চ হয়। তেমনি তাহার হাসি অট্টহাস্যের পর্যায়ে পৌঁছায় এবং চোখেও ইচ্ছা-পূর্বক দেখার লক্ষণ জন্মে। এই বয়সে তাহার মধ্যে আরো একটা স্বাভাবিক আচরণের স্ফুরণ ঘটে। সে তাহার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অঙ্গ-ভঙ্গিও দ্বারা প্রকাশ করে। সে কাহাকেও মারে এবং কাহাকেও কিছু দিতে চায়। কিন্তু এই সব ক্রিয়াই মূলত সহজাত। এইভাবে শিশুর ন্যায় অসভ্য মানুষও, যাহার মধ্যে মানবোচিত বিবেচনা শক্তি অত্যন্ত অল্প, তাহার প্রত্যেক কথা, কার্য, অঙ্গ-সঞ্চালন ও শান্তভাবের মধ্যে সহজাত আচার-ব্যবহারই প্রকাশ করে, এবং সে প্রবৃত্তির তাড়নার বশে চলে। তাহার কোন কাজ তাহার মানসিক শক্তি, বিচার বা চিন্তার ফলে প্রকাশিত হয় না। বরং যাহা কিছু প্রকৃতিগতভাবে তাহার মধ্যে সৃষ্টি হয়, উহাই পারি-পার্শ্বিকতার প্রতিক্রিয়ার তালে তাল মিলাইয়া প্রকাশিত হইতে থকে। ইহা সম্ভবপর যে, তাহার প্রকৃতিগত তাড়না, যাহা তাহার মধ্য হইতে কোন কিছুর প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়, সবই মন্দ নহে। বরং উহাদের কোন কোনটি সদাচারের সহিত মিলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এসবের মধ্যে চুল-চেরা বিচার, বিবেচনা ও যুক্তির কোন দখল থাকে না। যদি কিছু থাকেও, তাহা হইলে প্রবৃত্তির উত্তেজনার প্রাবল্য হেতু তাহা নির্ভরযোগ্য হয় না। বরং আধিক্য যেদিকে সেই দিকটাই নির্ভরযোগ্য।

প্রকৃত নৈতিকতা

বস্তুতঃ ঐরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত নৈতিকতার গুণ-সম্পন্ন বলা যায় না, যাহার উপর সহজাত বা স্বভাবজ আবেগ মানবেতর প্রাণী (অভদ্র), পাগল ও শিশুদিগের ন্যায় প্রবল থাকে এবং যে তাহার জীবন প্রায় অসভ্য বর্বরদের ন্যায় যাপন করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সাধু বা অসাধু চরিত্রের

বিকাশ তখন হইতেই শুরু হয়, যখন মানব খোদা-প্রদত্ত বুদ্ধিতে পরিপক্ক হইয়া, তদ্বারা সৎ ও অসৎ বা কুকর্ম ও সুকর্মের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে। অতঃপর, এক সময় সুপথ বর্জনে তাহার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কুকার্য করিলে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। ইহা তাহার জীবনের দ্বিতীয় স্তর। ইহাকে খোদার কালাম কুরআন শরীফে 'নাফসে লাউওয়ামাহ্' (তিরস্কারকারী আত্মা) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোন অসভ্য বর্বর মানুষকে 'নাফসে লাউওয়ামাহ্'র অবস্থায় আনিতে, শুধু ভাসা-ভাসা উপদেশ প্রদানই যথেষ্ট নহে। বরং প্রয়োজন, সে যেন খোদার পরিচয় লাভের যোগ্যতা অর্জন করে, যেন তাহার জন্মকে সে অহেতুক ও নিস্ফল মনে না করে এবং ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তিতে যেন তাহার মধ্যে সত্যিকারের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। সেইজন্য খোদাতা'লা সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ঐশীজ্ঞানের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে, প্রত্যেক কাজ ও নৈতিকগুণের একটা ফল আছে, যাহা ইহজীবনে আত্মিক সুখ বা আত্মিক শান্তির কারণ এবং পরজীবনে তাহাই সুস্পষ্টভাবে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে। বস্তুতঃ 'নাফসে লাউওয়ামাহ্'র পর্যায়ে মানুষ এরূপ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি এবং পবিত্র বিবেকের অংশ লাভ করে যে, কুকার্য করিলে নিজেকে তিরস্কার করে এবং সুকার্যে আগ্রহ ও স্পৃহা অনুভব করিতে থাকে। ইহাই সেই পর্যায় যেখানে মানুষ উন্নত চরিত্র লাভ করে।

খাল্‌ক ও খুল্‌ক

এই স্থানে আরবী 'খাল্‌ক' ও 'খুল্‌ক' শব্দের কিছু তাৎপর্য বর্ণনা করাও সমীচীন হইবে। 'খাল্‌ক' (خَلق) শব্দের 'খা' (خَا) অক্ষরে ফাতাহ্ (যবর) দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক সৃজন বুঝায়, এবং খুল্‌ক (خُلق) শব্দের 'খা' অক্ষরে যাম্মা (পেশ) দ্বারা বাতেনী বা আত্মিক সৃজন বুঝায়। বাতেনী সৃজন আখলাক বা নৈতিকতার দ্বারা পূর্ণত্বে পৌঁছাইয়া থাকে, শুধু স্বভাবজ আবেগ দ্বারা নহে। সেইজন্য, নৈতিক চরিত্রের জন্যই এই শব্দ ব্যবহৃত

হয়। স্বভাবজ আবেগ-উত্তেজনার জন্য ব্যবহৃত হয় না। তারপর ইহা বলা বাঞ্ছনীয় যে, সাধারণ লোক মনে করে, খুল্‌ক শুধু সহনশীলতা, নম্রতা ও বিনয়েরই অন্য নাম। ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। বরং বাহ্যিক কর্মসমূহের পিছনে তদানুযায়ী যেসব অভ্যন্তরীণ মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত আছে, ঐ সব বৈশিষ্ট্যরই নাম 'খুল্‌ক'। যেমন, মানুষ বাহ্যতঃ চক্ষু দ্বারা কাঁদে, কিন্তু ইহার পিছনে এক নৈতিক অভ্যন্তরীণ গুণ কাজ করে, যাহাকে বলা যায় মনের কোমলতা। মনের এই কোমলতা যখন খোদাপ্রদত্ত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাই হয় একটি 'খুল্‌ক'। তেমনি, মানুষ হস্ত দ্বারা শত্রুর সহিত সংগ্রাম করে এবং এই ক্রিয়ার উৎসস্বরূপ তাহার হৃদয়ে এক শক্তি আছে, যাহাকে বীরত্ব বলা হয়। সুতরাং, যখন মানুষ এই শক্তিকে যথাস্থানে যথাসময়ে ব্যবহার করে, তখন ইহাও খুল্‌ক বলিয়া অভিহিত হইবে। সেইরূপে, মানুষ যখন হস্ত দ্বারা কোন আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণকারী হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, অভাবী এবং বুভুক্ষুকে কিছু দান করিতে চাহে কিংবা অন্য কোন উপায়ে মানব -সেবা করিতে চাহে, তখন এই ক্রিয়ার প্রেরণাদানকারীরূপে তাহার হৃদয়ে এক শক্তি সক্রিয় হয়, যাহা দয়া নামে অভিহিত। কোনো সময়ে মানুষ হাত দ্বারা অত্যাচারীকে শাস্তি দেয়। এই ক্রিয়ার উদ্বুদ্ধকারী এক অভ্যন্তরীণ শক্তি হৃদয়ে আছে, যাহাকে প্রতিশোধপরায়ণতা বলা হয়। কখনও মানুষ আক্রমণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে চাহে না এবং অত্যাচারীর অত্যাচারকে উপেক্ষা করে। এই ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হৃদয়ে যে শক্তি আছে, তাহাকে ক্ষমা ও ধৈর্য বলা হয়। কোনো সময়ে মানুষ মানব জাতির হিতার্থে তাহার সঞ্চিত ধন ব্যয় করে। তখন এই ক্রিয়ার পিছনে যে নৈতিক শক্তি কার্যকরী থাকে তাহাকে দয়া ও দানশীলতা বলা হয়। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○ (সূরা ক্বলম, 68 : 5)

অর্থাৎ-"নিশ্চয় তুমি মহান নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত আছ" (৬৮ঃ৫)।

এখানে উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হইল, যাবতীয় চরিত্র-গুণ, যথা দানশীলতা, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, এহ্সান, সত্যবাদিতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রভৃতি তোমাতে সুসমন্বিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়ে যতগুলি বৃত্তি পাওয়া যায়, যথা শিষ্টাচার, লজ্জা, সততা, সৌজন্য, গয়রত (কুকার্যে বিরক্তি ও উষ্মা), দৃঢ়তা, কাম-সংযম, বিরাগ, নিয়মানুবর্তিতা, সহানুভূতি, বীরত্ব, সাহসিকতা, বদন্যতা, ক্ষমা, সহনশীলতা, ধৈর্য, দয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি স্বভাবজ অবস্থাসমূহ যখন যুক্তি ও চিন্তার আলোকে স্ব স্ব স্থানে ও পরিস্থিতিতে কার্যতঃ প্রকাশ করা হয়, তখন তাহাদের নাম হয় আখলাক বা নৈতিকতা। প্রকৃতপক্ষে, এইসব চরিত্র-গুণ মানুষের স্বভাবজ অবস্থা এবং স্বভাবজ আবেগ বিশেষ। এইগুলি সুনীতি বলিয়া শুধু তখনই অভিহিত হইতে পারে, যখন পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ ও পরিচালনায় উহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। যেহেতু মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, সে উন্নতিশীল প্রাণী, সেই জন্য সে সত্য ধর্মের অনুসরণে, সাধু-সঙ্গ ও সৎশিক্ষার ফলে, সকল প্রকার স্বভাবজাত আবেগ উত্তেজনাকে নৈতিকতায় রূপায়িত করিতে পারে। এই সৌভাগ্য অন্য কোন প্রাণীর ভাগ্যে জোটে না।

প্রথম ইস্লাহ ঃ

স্বভাবজ অবস্থার সংশোধনী

এখন আমরা কুরআন শরীফ বর্ণিত মানবের ত্রিবিধ অবস্থার ইস্লাহের মধ্যে প্রথম ইস্লাহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার সম্পর্ক নিম্নতম স্বভাবজ অবস্থার সহিত। এই ইস্লাহ্ আখলাকের ক্ষেত্রে আদব (শিষ্টাচার) নামে পরিচিত। অর্থাৎ, ঐ সকল সদাচার, যাহা পালন করিলে অসভ্য মানুষের স্বভাবজ ক্রিয়া-কর্ম, যথা, পানাহার, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত ও শোভনীয় হয় এবং বন্য,পাশব এবং হিংস্র জীবন যাত্রা হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। এই সকল সদাচার সম্বন্ধে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বলিয়াছেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ
الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ
الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (সূরা নিসা, 4 : 24)

لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ (সূরা নিসা, 4 : 20)

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ (সূরা নিসা, 4 : 23)

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ ..... لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ

(সূরা মায়েদা, 5 : 6)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ (সূরা নিসা, 4 : 30)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ (সূরা আন'আম, 6 : 152)

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ
اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ (সূরা নূর, 24 : 28-29)

وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۖ (সূরা বাকারা, 2 : 190)

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ (সূরা নিসা, 4 : 87)

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (সূরা মায়েদা, 5 : 91)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (সূরা মায়েদা, 5 : 4)

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ (সূরা মায়েদা, 5 : 5)

اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا (সূরা মুজাদিলা, 58 : 12)

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ (সূরা আ'রাফ, 7 : 32)

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ○ (সূরা আহ্যাব, 33 : 71)

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ○ (সূরা মুদ্দাস্সের, 74 : 5-6)

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ (সূরা লুকমান, 31 : 20)

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ (সূরা বাকারা, 2 : 198)

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ (সূরা মায়েদা, 5 : 7)

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○ (সূরা যারিয়াত, 51 : 20)

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ (সূরা নিসা, 4 : 4-5)

অর্থাৎ, "তোমাদের জন্য তোমাদের জননীগণকে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছে এবং সেইরূপ ভাবেই নিষিদ্ধ তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাতিজী, তোমাদের ভাগিনী এবং তোমাদের স্তন্যদায়িনী মাতা এবং তোমাদের দুগ্ধ-ভগ্নী, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাগণ, যাহাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সহিত তোমরা সহবাস করিয়াছ, এবং যদি সহবাস না করিয়া থাক, তবে কোন পাপ নাই এবং তোমাদের নিজ পুত্রবধুগণ এবং সেই প্রকারে একই সময়ে দুই ভগ্নী। এইসব কাজ যাহা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল (৪ঃ২৪)। ইহাও তোমাদের জন্য বৈধ নহে যে, বলপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হও (৪ঃ২০)। ইহাও বৈধ নহে যে, তোমরা ঐসব স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও, যাহারা তোমাদের পিতার স্ত্রী ছিল। ইতিপূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিয়াছে (৪ঃ২৩)। সতী স্ত্রীলোকগণকে তোমাদের মধ্য হইতে বা পূর্ববর্তী শাস্ত্রধারী আহলে-কেতাবের মধ্য হইতে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ,কিন্তু কেবল তখন, যখন মোহরানা নির্ধারণ করিয়া বিবাহ কর। ব্যভিচার বৈধ নহে এবং গোপন বন্ধুত্বও বৈধ নহে" (৫ঃ৬)। আরবের অজ্ঞদের মধ্যে যাহাদের কোন সন্তান হইত না, তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, সন্তান লাভের জন্য তাহাদের স্ত্রী অন্যের সঙ্গে প্রণয় করিত। কুরআন শরীফ এই আচরণকেও হারাম করিয়াছে। এই কুপ্রথার নাম **'মুসাফেহাত'**।

তারপর বলিয়াছেন ঃ " তোমরা আত্ম-হত্যা করিবে না (৪ঃ৩০)। নিজেদের সন্তানকেও বধ করিবে না (৬ঃ১৫২) এবং অসভ্যের ন্যায় অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে আপনা আপনি প্রবেশ করিবে না। অনুমতি

নেওয়াই শর্ত। তোমরা যখন অন্যের ঘরে যাও, তখন প্রবেশ দ্বারে পৌঁছানো মাত্র 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিবে। যদি ঐ সব গৃহে কেহ না থাকে, তবে যে পর্যন্ত না কোনো গৃহ-স্বামী তোমাদিগকে অনুমতি দেয়, ঐ সব গৃহে যাইবে না এবং যদি গৃহ-স্বামী ফিরিয়া যাইতে বলে, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হইবে (২৪ঃ২৮-২৯) কোনো গৃহে দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে না। বরং গৃহের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে (২ঃ১৯০) এবং যদি কেহ তোমাদিগকে সালাম বলে, তবে তাহাকে তাহা হইতে উত্তম ও আশিস-পূর্ণ সালাম বলিবে (৪ঃ৮৭)। মদ, জুয়া, পৌত্তলিকতা, ভাগ্য-গণনা, এই সবই অপবিত্র ও শয়তানী কাজ। এইগুলি হইতে বাঁচিয়া চলিবে (৫ঃ৯১)। মৃত জন্তুর এবং শূকরের মাংস খাইবে না। প্রতিমার নিকট উৎসর্গীকৃত (বস্তু) ভক্ষণ করিবে না। লাঠির আঘাতে নিহত প্রাণী খাইবে না। পতনে মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই প্রকার মৃত জীব খাইবে না। শিং-এর আঘাতে মৃত জীব খাইবে না। হিংস্র জন্তুর দ্বারা ছেঁড়া-ফাড়া প্রাণী খাইবে না। মূর্তির উদ্দেশ্যে সমর্পিত জিনিস খাইবে না। এই সবই মৃত-তুল্য (৫ঃ৪)। যদি লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তবে কি খাইব? প্রত্যুত্তরে বলিবে যে, পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র জিনিস খাইবে" (৫ঃ৫)। শুধু মৃত, মৃতের অনুরূপ এবং অপবিত্র জিনিস খাইবে না।

যদি মজলিসে বৈঠকে তোমাদিগকে প্রসারিত হইয়া বসিতে বলা হয়, অর্থাৎ অন্যের জন্য স্থান করিতে বলা হয়, তৎক্ষণাৎ স্থান প্রশস্ত করিবে, যাহাতে অন্যেরাও বসিতে পারে। যদি তোমাদিগকে উঠিয়া যাইতে বলা হয়, তবে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া যাইবে (৫৮ঃ১২)। মাংস, ডাল ইত্যাদি সব জিনিসই পবিত্র হইলে নিঃসন্দেহে খাইবে। কিন্তু কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করিবে না। অমিতাচার এবং অপরিমিত ভোজন হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে (৭ঃ৩২)। বৃথা কথা বলিবে না। স্থান ও সময় উপযোগী কথা বলিবে (৩৩ঃ৭১)। তোমাদের কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। দেহ, গৃহ, গলি এবং তোমাদের বসিবার সকল স্থান অপবিত্রতা, ময়লা ও আবর্জনা হইতে মুক্ত রাখিবে। গোসল করিবে এবং ঘর পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করিবে (৭৪ঃ৫-৬)। খুব উচ্চ কণ্ঠে কথা

বলিবে না এবং অত্যন্ত মৃদু স্বরেও কথা বলিবে না। মধ্যম পন্থা গ্রহণ করিবে; তবে প্রয়োজনের সময় অন্য কথা (৩১ঃ২০)। চলিবার সময় খুব দ্রুত চলিবে না। অত্যন্ত আস্তেও চলিবে না। মাঝামাঝি গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। সফরের সময় সব দিক দিয়া প্রবাসের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া লইবে; যথেষ্ট পরিমাণে পথের খরচ সঙ্গে লইবে, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে রক্ষা পাও (২ঃ১৯৮)। অশৌচ অবস্থায় স্নান করিবে (৫ঃ৭)। খাওয়ার সময় আহার-প্রার্থীকে দান করিবে এবং কুকুরকেও দিবে। যদি সম্ভব হয়, পাখী এবং অন্যান্য প্রাণীকেও খাবার দিবে (৫১ঃ২০)। এতীম মেয়ে, যাহাদের তোমরা ভরণ পোষণ কর, তাহাদিগকে বিবাহ করায় দোষ নাই। কিন্তু যদি মনে কর যে, তাহাদের অসহায়ত্ব তোমাদিগকে সীমা-লঙ্ঘনে প্রলুব্ধ করিতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকিলে, এমন সব মেয়েকে বিবাহ করিবে, যাহাদের মাতা-পিতা ও নিকট আত্মীয় রহিয়াছে, যাহারা তোমাদিগকে সংযত রাখিবে ও শাসনে রাখিবে। এক, দুই, তিন, চারি বিবাহ পর্যন্ত করিতে পারিবে,যদি তোমরা সমতা রক্ষা করিতে পার এবং যদি সমতা রক্ষা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজন হইলেও শুধু একেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। চারি বিবাহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যাহাতে তোমরা পুরাতন অভ্যাসের তাগিদে সীমালঙ্ঘন না কর। অর্থাৎ শত শত সংখ্যায় না পৌঁছাও বা ব্যভিচারের দিকে যেন আকৃষ্ট না হও। এবং তোমাদের নিজেদের স্ত্রীদের মোহরানা দাও (৪ঃ৪-৫)।

বস্তুতঃ ইহা কুরআন শরীফের প্রথম ইস্‌লাহ। এই ইস্‌লাহ বা সংস্কার দ্বারা মানুষের স্বভাবজ অবস্থাকে অসভ্য ও বর্বর পন্থাসমূহ হইতে টানিয়া আনিয়া মানবতার উপযোগী সামাজিক সভ্যতার প্রতি মনোযোগী করা হইয়াছে। এই শিক্ষায় এখনও উন্নত চরিত্রের কোনই উল্লেখ নাই। এখানে শুধু মানবতার শিষ্টাচারসমূহই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আমরা লিখিয়াছি যে, এই শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে জাতির শুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহারা বর্বরতার চরমে নিপতিত হইয়াছিল। কোন দিক দিয়াই মানবতার কোনো নীতি বা শিক্ষা তাহাদের মধ্যে ছিল না। সুতরাং

তাহাদিগকে সর্বাগ্রে মানবতার বা বাহ্যিক সদাচারের শিক্ষা দান করা প্রয়োজন ছিল।

শূকর নিষিদ্ধ (হারাম)

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এখানে স্মরণ রাখার যোগ্য এবং উহা হইল শূকর হারাম হওয়া সম্পর্কিত। খোদাতা'লা আদি হইতে ইহার নামের মধ্যেই নিষেধের দিকে ইংগিত করিয়াছেন। কারণ, আরবী 'খিন্‌যীর' শব্দ 'খিন্‌য' ও 'আরা' ধাতু দ্বারা গঠিত। ইহার অর্থ আমি ইহাকে অত্যন্ত কলহপূর্ণ ও মন্দ দেখিতেছি। খিন্‌য অর্থ অত্যন্ত দূষিত এবং আরা অর্থ দেখিতেছি। সুতরাং এই জন্তু যে নাম আদি হইতে খোদাতা'লার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা তাহার অপবিত্রতা নির্দেশ করে। আরো একটি আশ্চর্য সমন্বয় এই যে, হিন্দি ভাষায় এই জন্তুকে 'শূয়ার' বলে। এই শব্দ 'শূ' এবং 'আর' দ্বারা গঠিত। অর্থ হইল আমি ইহাকে অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় দেখিতেছি। ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই যে, 'শূ' শব্দ কি প্রকারে আরবী হইল? কারণ আমরা আমাদের প্রণীত **'মিনানুর রহমান'** গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি যে, সব ভাষার জননী আরবী ভাষা। আরবী শব্দ প্রত্যেক ভাষাতেই একটি দুইটি নহে বরং সহস্র সহস্র সংখ্যায় মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং, 'শূ' শব্দ আরবী। এজন্য হিন্দিতে শূয়ারের অনুবাদ বদ বা মন্দ। সুতরাং ইহাকে 'বদ' ও বলা হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যে যুগে আরবী সারা পৃথিবীর ভাষা ছিল, তখন এদেশে এই জন্তুর নাম আরবীতে প্রসার লাভ করিয়েছিল। ইহা 'খিন্‌যীর' শব্দের সম-অর্থ প্রকাশক এবং প্রতিশব্দ। এখন পর্যন্ত উহার স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে, সংস্কৃত ভাষায় ইহার নিকটবর্তী শব্দ বিকৃত হইয়া অন্য কিছু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ শব্দ ইহাই। কারণ ইহাতে নামকরণের কারণও নিহিত রহিয়াছে। 'খিন্‌যীর' শব্দ দ্ব্যর্থহীনভাবে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই শব্দের এই যে অর্থ, অর্থাৎ অত্যন্ত বদ, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। একথা কে না জানে যে, এই জন্তু প্রথম শ্রেণীর মল ভক্ষক, নাপাক,নির্লজ্জ এবং লম্পট। ইহা হারাম বা অবৈধ হওয়ার কারণ অতি স্পষ্ট। প্রাকৃতিক বিধান ইহাই চাহে যে, এই প্রকার অপবিত্র, বদ জন্তুর

মাংসের ক্রিয়া দেহ ও আত্মার উপর অপবিত্রই হইবে। কারণ আমরা প্রমাণ করিয়া অসিয়াছি যে, মানুষের আত্মার উপর খাদ্যেরও সুনিশ্চিত ক্রিয়া হয়। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ কি যে, এইরূপ মন্দ জিনিসের ক্রিয়াও মন্দই হইবে। গ্রীক চিকিৎসাবিদগণ প্রাগ ইসলামী যুগেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, লজ্জাহীনতার সৃষ্টি এই জন্তুর মাংসের গুণগত বৈশিষ্ট্য। অশ্লীলতা বৃদ্ধিও ইহা ভক্ষণের অবশ্যম্ভাবী কুফল। মৃত (পশুপাখী) খাওয়াও এই (ইসলামী) শরীয়তে এই জন্যই নিষেধ করা হইয়াছে যে, মৃতও ইহার ভক্ষককে আপন দোষে দুষ্ট করে। অধিকন্তু দূষিত, স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি সাধন করে। যে সকল জন্তুর রক্ত ভিতরেই থাকে, যেমন, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বা লাঠির আঘাতে মারা যায়, সে সব জন্তু আসলে লাশের অবস্থার অন্তর্গত। মৃতের রক্ত ভিতরে থাকিয়া সঠিক অবস্থায় থাকিতে পারে কি? না। বরং তাহা তরল বস্তু বলিয়া অতি শীঘ্র পচিবে এবং ইহার পচনে সাকল্য মাংসই নষ্ট হইয়া যাইবে। তারপর, আধুনিক গবেষণা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রক্তের জীবাণু মরিয়া দেহে বিষাক্ত পচন সঞ্চারিত করে।

মানুষের নৈতিক অবস্থা

কুরআনের বর্ণিত ইসলাহের দ্বিতীয় বিভাগ হইল স্বভাবজ প্রেরণা বা তাড়নাকে যথোপযুক্ত গুণাবলীর সহিত সমন্বয় করিয়া উন্নত চারিত্র্যে রূপায়িত করা। সুতরাং, জানা আবশ্যক যে, এই বিভাগটি বেশ ব্যাপক। যদি আমরা এই বিভাগ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, অর্থাৎ কুরআন শরীফ বর্ণিত যাবতীয় নৈতিক গুণ বা নীতি এখানে লিখিতে যাই, তবে এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে যে, নির্ধারিত সময় উহার দশমাংশের জন্যও যথেষ্ট হইবে না। এজন্য এখানে নমুনা হিসাবে কতিপয় উন্নত নৈতিক গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করা যাইতেছে।

জানা দরকার যে, আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী) দুই প্রকারের। প্রথমতঃ সেই আখলাক, যাহা দ্বারা মানুষ গর্হিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, ঐ সকল নৈতিক গুণ যাহা দ্বারা মানুষ কল্যাণকর আচরণে সক্ষম হয়। অকল্যাণ বা অনিষ্ট ত্যাগ অর্থে ঐসব আখলাককে বুঝায়,

যাহা দ্বারা মানুষ চেষ্টা করে যেন, তাহার জিহ্বা, তাহার হাত, তাহার চক্ষু বা তাহার অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অন্যের সম্পদ, সম্মান বা প্রাণের কোন ক্ষতি সাধন না হয়, কিংবা কোন অনিষ্টের বা মানহানির ইচ্ছা না হয়। কল্যাণ বা হিত সাধন অর্থে সেই সম্যক গুণকেই বুঝায়, যদ্বারা মানুষ চেষ্টা করে, যেন তাহার জিহ্বা, হাত বা জ্ঞান দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে অন্যের ধন বা সম্মানের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। কিংবা তাহার প্রতাপ বা সম্মান প্রকাশে সাহায্য করিতে পারে। কিংবা কেহ তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়া থাকিলে অত্যাচারী যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাহা সে ছাড়িয়া দেয় এবং এই প্রকারে তাহাকে কষ্ট পাওয়া হইতে এবং দৈহিক ও আর্থিক দন্ড হইতে নিরাপত্তা রাখার মত উপকার সাধন করে বা তাহাকে এতটুকু সাজা দেয়, যাহা প্রকৃত পক্ষে তাহার জন্য প্রত্যক্ষ করুণাস্বরূপ হয়।

অকল্যাণ (Evil) পরিহার সম্পর্কিত চারিত্রিক গুণ

এখন জানা আবশ্যক যে, সেই আখলাক যাহা পরম পরাৎপর স্রষ্টা অকল্যাণ পরিহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা আরবী ভাষায় চারিটি বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা, চাল-চলন এবং ভিন্ন ভিন্ন আখলাকের প্রকাশের জন্য আরবীতে বিশেষ অর্থবোধক ভিন্নভিন্ন শব্দ রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে প্রথম চরিত্র-গুণ (إِحْصَان) এহ্সান নামে আখ্যায়িত। এই শব্দ দ্বারা ঐ বিশিষ্ট ধরণের পবিত্রতাকে বুঝায়, যাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রজনন শক্তির সহিত সম্পর্কিত এবং মুহ্সেন (مُحْصِن) বা মুহ্সেনা, (مُحْصِنَة) ঐ পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বলা হয়, যে ব্যভিচার বা উহার সূচনা বা ভূমিকা হইতে পৃথক থাকিয়া ঐ নাপাক কুক্রিয়া হইতে নিজেকে সংযত রাখে, যাহার কুফল উভয়ের জন্য এ পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও অভিশাপ এবং পরলোকের শাস্তি ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনগণের লজ্জা এবং ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও স্ত্রীর সহিত অবৈধ কাজ করে, কিংবা ব্যভিচার না করিয়া যদি উহার সূচনা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে

কোন সন্দেহ নাই যে, আত্ম-মর্যাদা বোধ-সম্পন্ন নির্যাতিত ব্যক্তির পক্ষে যে স্ত্রী ব্যভিচারে উদ্যত হইয়াছিল, বা ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে তালাক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এই স্ত্রীর গর্ভ ধারণে সন্তান হইলে, সন্তানদেরও মহা বিপদ হয় এবং গৃহ-স্বামীকে এই সকল ক্ষতি সেই দুশ্চরিত্রার জন্যই ভোগ করিতে হয়।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই যে চরিত্র গুণ এহ্সান অর্থাৎ চারিত্রিক পবিত্রতা বা সতীত্ব, সেই অবস্থায় খুল্‌ক বলিয়া আখ্যায়িত হইবে, যখন ঐরূপ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে কুদৃষ্টি বা কুকার্যের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ প্রকৃতি যাহাকে ঐ ক্ষমতা দিয়াছে, যদ্বারা সে এই অপরাধে লিপ্ত হইতে পারে, সে ঐ কুকর্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করে। যদি শিশু কিংবা নপুংসক বা খোজা বা অসমর্থ বৃদ্ধ হওয়ার দরুন এই ক্ষমতা কাহারও না থাকে, তবে তাহাকে এই অবস্থায় সেই চরিত্রগুণে গুণান্বিত বলা যাইবে না, যাহার নাম সতীত্ব বা এহ্সান বা ইফ্ফাত। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, সতীত্ব বা এহ্সানের একটা স্বভাবজ অবস্থা তাহার মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা বার বার লিখিয়াছি যে, স্বভাবজ অবস্থার নাম চরিত্রগুণ বা নৈতিকতা নহে। বরং উহা তখনই নৈতিকতা বা চরিত্রগুণ বলিয়া গণ্য হইবে যখন বিচার-বিবেচনা ও যুক্তির আশ্রয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইবে বা প্রকাশের যোগ্যতা রাখিবে। সুতরাং আমি যেমন লিখিয়াছি যে, শিশু, নপুংসক এবং যাহারা কোন বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেদের পুরুষত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা এই চরিত্রগুণের আওতায় আসে না। যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাহারা চারিত্রিক পবিত্রতায় বা সতীত্বের মধ্যেই জীবন যাপন করে, তথাপি তাহাদের এই অবস্থার নামও স্বভাবজ অবস্থা, অন্য কিছু নহে। যেহেতু উল্লিখিত অপবিত্র ক্রিয়া-কলাপ এবং সূচনা পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক দ্বারাও প্রকাশিত হইতে পারে, এজন্য খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ .....
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (সূরা নূর, 24 : 31, 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○ (সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 33)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا (সূরা নূর, 24 : 34)

وَ رَهْبَانِيَّةَ ۟ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ (সূরা হাদীদ 57: 28)

অর্থাৎ "ঈমানদার পুরুষগণকে বল যে, তাহাদের চক্ষুদ্বয়কে না-মাহ্‌রাম [যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ (অনুবাদক)] স্ত্রীলোকদিগকে দেখা হইতে যেন বাঁচাইয়া রাখে এবং ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগকে খোলা চোখে না দেখে, যাহারা কামোদ্রেকের ক্ষেত্র হইতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে আনত দৃষ্টির অভ্যাস করিবে এবং আপন লজ্জাস্থানকে যে প্রকারে হউক বাঁচাইবে। অনুরূপভাবে, না-মাহ্‌রাম ও অনাত্মীয় স্ত্রীলোকদের গান, বাদ্য ও সুললিত কণ্ঠ শুনিবে না। তাহাদের রূপ কাহিনী শুনিবে না। এই নিয়ম দৃষ্টিকে পবিত্র রাখিবার এবং চিত্তকে অবিকৃত রাখিবার উত্তম পন্থা। তেমনি ঈমানদার স্ত্রীলোকদিগকে বল যে, তাহারাও যেন তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের কানকে না-মাহ্‌রাম পুরুষ হইতে রক্ষা করে। অর্থাৎ তাহাদের কামোদ্দীপক স্বর শুনিবে না এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলিকে আবৃত রাখিবে এবং সৌন্দর্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন না-মাহ্‌রাম ব্যক্তির নিকট অনাবৃত করিবে না এবং ওড়না-চাদর এমনভাবে মাথায় দেবে যেন, কণ্ঠদেশ হইতে মাথায় পৌঁছায়। অর্থাৎ, গ্রীবা, দুই কান, মাথা এবং কানপট্টি

সব যেন চাদরের পর্দায় ঢাকা থাকে। নর্তকীদের ন্যায় মাটিতে পদযুগল দ্বারা আঘাত হানিবে না। ইহা সেই পন্থা যাহা অবলম্বন করিলে পদস্খলন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে"(২৪ঃ৩১-৩২)।

বাঁচিবার দ্বিতীয় উপায়– খোদামুখী হইবে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে যেন তিনি হোঁচট খাওয়া হইতে এবং পদস্খলন হইতে বাঁচান। ব্যভিচারের কাছেও যাইবে না (১৭ঃ৩৩)। অর্থাৎ এমন আচার-অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিবে, যাহা মনে কুপ্রভাবের উদ্রেক করিতে পারে। এমন সব পথ ধরিবে না, যেখানে এই পাপ সংঘটনের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে, সে পাপকে শেষ সীমানায় পৌঁছায়। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ, ইহা গন্তব্য পথকে রুদ্ধ করে এবং তোমাদের শেষ মঞ্জিলের (গন্তব্যস্থান) জন্য এ পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিবাহ করিতে পারে না, তাহার কর্তব্য সে তাহার পবিত্রতাকে অন্য উপায়ে রক্ষা করিবে (২৪ঃ৩৪)। যেমন, রোযা রাখিবে, স্বল্পাহার করিবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করিবে। অন্যান্য লোক এই পথ উদ্ভাবন করিয়াছে যে, তাহারা চির কুমার থাকিবে বা খোজা হইবে এবং যে কোন উপায়ে হউক সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিবে (৫৭ঃ২৮)। কিন্তু আমরা মানুষের উপর এই আদেশ অবশ্য-পালনীয় করি নাই। এই কারণে তাহারা এই সব অভিনব স্বকল্পিত প্রথা পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে নাই। "মানুষ খোজা হউক, ইহা আমার আদেশ নয়" খোদাতা'লার একথা বলার মধ্যে এই সংকেত রহিয়াছে যে, ইহা খোদার আদেশ হইলে সব লোকই এই আদেশ পালনে সক্ষম হইত। তদবস্থায় সমগ্র মানবজাতি কবেই বংশহীন হইয়া জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যাইত। যদি পবিত্রতা লাভ করিতে পুরুষাঙ্গ কর্তন করিতে হইত, তাহা হইলে ইহা প্রকারান্তরে সেই মহান স্রষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি হইত, যিনি উক্ত অঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর যখন সওয়াব বা পুণ্যার্জন সম্পূর্ণ এ কথার উপর নির্ভর করে যে, ক্ষমতা থাকিবে, অথচ মানুষ খোদাতা'লার ভয়ে এই ক্ষমতার কদর্য ব্যবহার করিবে না; বরং কদর্য উত্তেজনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং ইহার উপকারিতা দ্বারা লাভবান হইয়া দুই প্রকারের পুণ্য অর্জন করিবে। সুতরাং, ইহা সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গকে নষ্ট করার অর্থ উভয় প্রকার সওয়াব হইতে বঞ্চিত হওয়া। পুণ্য লাভ হয় বিরোধী

উত্তেজনার উপস্থিতিতে ও উহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। কিন্তু শিশুর ন্যায় যাহার এই শক্তিই নাই, সে কি সওয়াব পাইবে? শিশু কি চারিত্রিক পবিত্রতার সওয়াব পাইতে পারে?

কাম সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায়

এই আয়াতগুলিতে খোদাতা'লা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নাই, বরং মানুষকে কাম বিষয়ে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলিয়া দিয়াছেন যথাঃ (১) না-মাহ্‌রাম নারীকে দর্শন হইতে পুরুষের চক্ষুকে বাঁচানো। (২) না-মাহ্‌রাম পুরুষের কণ্ঠ শ্রবণ হইতে নারীর কানকে বাঁচানো। (৩) না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোক ও পুরুষের সম্বন্ধে গল্প শ্রবণ না করা। (৪) আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলা। (৫) বিবাহ না হইলে, রোযা রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা জোর দাবীর সঙ্গে বলিতেছি যে, এই সকল চেষ্টা-তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তাহা এই যে, মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যাহা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তাহা হইতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হইতে পারে না। বরং মহাবিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। সেই কারণেই খোদাতা'লা আমাদিগকে পবিত্র মনোভাব লইয়া না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকদিগকে অবাধে দর্শন করার, তাহাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখিয়া এবং তাহাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিবারও অনুমতি দেন নাই। বরং আমাদিগকে তাকিদ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন না-মাহ্‌রাম স্ত্রীলোককে এবং তাহার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নহে; তাহাদের সুকণ্ঠ, তাহাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নহে; বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন উহা শোনা ও দেখাকে মৃত্যুসম ভয় ও ঘৃণা করি, যাহাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হইতে পারে। সুতরাং, যেহেতু

খোদাতা'লা চাহেন যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেইজন্য তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী শিক্ষা দান করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সম্মুখে নরম নরম রুটি রাখিয়া আশা করি যে, কুকুরের প্রাণে এই রুটির কোন খেয়াল জন্মিবে না, তবে আমরা আমাদের এই ধারণা পোষণে ভুল করিব। সুতরাং খোদাতা'লা চাহিয়াছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাহাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

ইসলামী পর্দার ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং ইহাই শরীয়তের ব্যবস্থা। খোদার পবিত্র গ্রন্থে পর্দার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, স্ত্রীলোকদিগকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখা। এইরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞ লোকেরা রাখে যাহারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরস্পরকে অবাধ দর্শন হইতে ও পরস্পরের শোভা-সৌন্দর্যের আকর্ষণ হইতে বিরত থাকা। কারণ ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল। পরিশেষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চোখ অবনত রাখিয়া অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইতে আত্মরক্ষা করার এবং সমগ্রভাবে দর্শন-যোগ্য জিনিষ দেখার যে পন্থা, উহাকে আরবী ভাষায় **'গায্যেবসর'** বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি নিজের হৃদয় পবিত্র রাখিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে মানবেতর জন্তুদের ন্যায় যেদিকে ইচ্ছা অবাধে চাহিয়া দেখা উচিত নহে। বরং তাহার পক্ষে সামাজিক জীবনে **'গায্যেবসর'**-এর অভ্যাস অত্যাবশ্যক। ইহা সেই শুভ এবং আশিসপূর্ণ অভ্যাস, যাহার ফলে তাহার এই স্বভাবজ অবস্থা এক মহান নৈতিক গুণরূপে রূপায়িত হইবে, অথচ তাহার সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। এই চরিত্র গুণকেই ইহ্সান ও ইফ্ফাত বা কামবৃত্তির পবিত্রতা বলা হয়।অকল্যাণ পরিহারের দ্বিতীয় প্রকার খুল্ক (চারিত্রিক গুণ) আমানত ও দিয়ানত (সততা ও বিশ্বস্ততা) নামে পরিচিত। অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ অসৎ উপায়ে ও অসদুদ্দেশ্যে হস্তগত করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়ায় অনীহা ও অসম্মতি। সুতরাং জানা আবশ্যক, দিয়ানত

ও আমানত স্বভাবজ অবস্থাসমূহের অন্যতম। এই জন্য দুধের শিশু, যে অল্প বয়সবশতঃ স্বভাবতই সরলচিত্ত এবং বয়সের স্বল্পতার জন্য এখনও কু অভ্যাসগ্রস্ত হয় নাই, অন্যের জিনিষের প্রতি তাহার এত ঘৃণা থাকে যে, তাহাকে অন্য স্ত্রী লোকের দুগ্ধ পান করান একটা কঠিন ব্যাপার। বুদ্ধি বিকাশের বয়সের পূর্বে যদি কোন ধাত্রী নিয়োগ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি হইবার বয়সে তাহাকে অন্যের দুধ পান করান অত্যন্ত মুশকিল হইয়া পড়ে এবং সে প্রাণে অনেক কষ্ট সহ্য করিবে, এমনকি এই কষ্টে তাহার প্রাণ ত্যাগের উপক্রম হইবে, তবু সে অন্য স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান হইতে স্বভাবতই পরান্মুখ থাকিবে। এত ঘৃণার তাৎপর্য কি? শুধু ইহাই যে, সে মা ছাড়া অন্যের দুধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে স্বভাবতই ঘৃণা করে।

আমরা শিশুর এই অভ্যাসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে এবং ইহা লইয়া চিন্তা করিলে এবং চিন্তা করিতে থাকিলে যখন শিশুর এই অভ্যাসের মূলে যাইয়া পৌঁছাই, তখন আমাদের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, যে স্বভাব অন্যের জিনিষের প্রতি এত ঘৃণার সৃষ্টি করে, নিজেকে বিপদাপন্ন পর্যন্ত করে, উহাই সততার মূল। সততার স্বভাবগুণে কেহই সৎ ও সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাহার হৃদয়ে অন্যের ধন-সম্পদ সম্পর্কে শিশুর ঘৃণার ন্যায় ঘৃণা জন্মে। কিন্তু শিশু এই অভ্যাস সঠিক স্থান কাল ও পরিস্থিতিতে পালন করে না এবং বুদ্ধি না থাকার ফলে সে অনেক কষ্ট পায়। অতএব, তাহার এই অভ্যাস শুধু একটা স্বভাবজ অবস্থা, ইহা 'খুল্‌ক' বা নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে না, যদিও মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সততা ও বিশ্বস্ততার উহাই মূল। শিশু তাহার এই অবোধ ক্রিয়ার ফলে যেমন বিশ্বস্ত হওয়ার আখ্যা লাভ করিতে পারে না, তেমনই ঐ ব্যক্তিও এই চরিত্র গুণে গুণবান নহে, যে এই স্বভাবজ অবস্থাকে যথার্থ স্থানে প্রয়োগ বা ব্যবহার করে না। মোট কথা, বিস্বস্ত ও সৎ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে পর্যন্ত মানুষ এই গুণের সব দিক পালন না করে সে আমীন ও দিয়ানতদার (বিশ্বস্ত ও সাধু) হইতে পারে না। এ সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌তা'লা আমানতের নীতি আদর্শ এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا
وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ
فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا
اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
حَسِيْبًا ○ (সূরা নিসা, 4: 6-7)

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ
بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۧ ○ (সূরা নিসা, 4: 10-11)

অর্থাৎ "যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোন ধনী ব্যক্তি থাকে, যাহার বুদ্ধি ঠিক নাই, যেমন এতীম বা নাবালক, এবং আশঙ্কাও হয় যে, সে তাহার বুদ্ধিহীনতাবশতঃ তাহার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিবে, তবে তোমরা (কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্রূপে) তাহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অভিভাবক হিসেবে তোমাদের হস্তে গ্রহণ করিবে এবং সেই ধন-সম্পত্তি, যদ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য চলে এবং জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই বুদ্ধিহীনদিগের হাতে সমর্পণ করিবে না এবং সেই সম্পত্তি হইতে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের খাওয়া পরার জন্য দিবে এবং তাহাদিগকে উত্তম কথা ও কাজের কথা বলিবে। অর্থাৎ, এমন কথা, যদ্বারা তাহাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি বর্ধিত হয়, আর তাহারা অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে এবং অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ থাকিয়া না যায়। তাহারা বণিকের সন্তান হইলে তাহাদিগকে বাণিজ্য পরিচালনার কৌশল শিখাইবে। অন্য ব্যবসায় থাকিলে সেই ব্যবসায়ে তাহাদিগকে পারদর্শী করিবে। যাহা হউক, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষাও করিবে, তোমরা যাহা শিখাইয়াছ তাহা আয়ত্ত করিয়াছে কিনা। অতঃপর বিবাহের উপযোগী হইলে, অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমে যখন দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার

বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহাদের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে। তাহাদের ধন-সম্পদ অপব্যয় করিবে না। বড় হইলে তাহাদের ধন-সম্পদ তাহারা ফিরাইয়া লইবে, এই ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের ধন-সম্পদের কোন ক্ষতি করিবে না। অভিভাবকত্ব করার জন্য, ধনী ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের অর্থ হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু অভিভাবক যদি বিত্তহীন হয়, তবে ন্যায্য পরিমাণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবে।"

আরবে অর্থ সংরক্ষকদের এই রীতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, এতীমের কার্য-নির্বাহককে এতীমের ধন-সম্পদ হইতে কিছু গ্রহণ করিতে হইলে, যথাসম্ভব এই নিয়ম পালন করিত যে, এতীমের অর্থে বাণিজ্য দ্বারা যে লাভ হইত, তাহা হইতে নিজেও লইত। কিন্তু মূলধন বিনষ্ট করিত না। সুতরাং এখানে এই প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে, 'তোমরাও এই প্রকার করিবে।' অতঃপর বলিয়াছেনঃ "এতীমের ধন-সম্পদ প্রত্যর্পণের সময় সাক্ষীর সম্মুখে প্রত্যার্পণ করিবে (৪ঃ৬-৭)। দুর্বল ও অল্প বয়স্ক সন্তান থাকিলে অন্তিম সময়ে এমন কোন ওসীয়্যত বা উইল করিবে না, যদ্বারা তাহাদের স্বার্থহানি হয়। যাহারা এই প্রকারে এতীমের ধন-সম্পদ ভোগ করে, যাহাতে তাহাদের প্রতি যুলুম করা হয়, তাহারা ধন-সম্পদ ভোগ করে না বরং আগুন ভোগ করে। তাহারা পরিশেষে, দগ্ধকারী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে" (৪ঃ১০-১১)।

এখন দেখ, খোদাতা'লা সততা ও বিশ্বস্ততার কত দিক শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং বর্ণিত সব দিক প্রতিপালিত হইলে, তবেই উহাকে প্রকৃত সততা ও বিশ্বস্ততা বলিবে। নতুবা যদি পুরাপুরি বিচার ও বুদ্ধির সাথে বিশ্বস্ততার সব দিকে লক্ষ্য রাখা না হয়, তবে এই প্রকার সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনেক প্রকারের গুপ্ত অবিশ্বস্ততা, গোপন খেয়ানতও (আত্মসাৎ) লুক্কায়িত থাকিবে। তারপর অন্যত্র বলিয়াছেন;

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (সূরা বাকারা, 2 : 189)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا (সূরা নিসা 4 : 59)

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۚ (সূরা আনফাল 8 : 59)

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ
(সূরা বনি ইসরাঈল 17 : 36)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ (সূরা আল্ আ'রাফ, 7 : 86)

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○ (সূরা বাকারা, 2 : 61)

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ (সূরা নিসা, 4: 3)

অর্থাৎ "তোমরা আপসের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করিও না এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ঘুষরূপে কর্তৃপক্ষের নিকট এই উদ্দেশ্য লইয়া পেশ করিবে না যে, এই প্রকারে কর্তৃপক্ষের সাহায্যে অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে পারিবে (২ঃ১৮৯)। গচ্ছিত ধন (আমানত) প্রকৃত হক্‌দারকে প্রত্যার্পণ করিবে (৪ঃ৫৯)। খোদা খেয়ানতকারী (গচ্ছিত ধনে হস্তক্ষেপকারী)- দিগকে পছন্দ করেন না(৮ঃ৫৯)। তোমরা মাপের সময় পুরা মাপিবে এবং ওজনের সময় পুরা ওজন করিবে। নির্দোষ দাঁড়ী পাল্লা দিয়া ওজন করিবে (১৭ঃ৩৬)। কোন প্রকারে কাহারও অর্থের ক্ষতি করিবে না। ফেৎনা-ফাসাদের সংকল্প লইয়া পৃথিবীতে চলাফেরা করিবে না (২৬ঃ১৮৪)। চুরি, ডাকাতি, পকেট কাটা বা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে অন্যের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করিবার সংকল্প রাখিবে না।" অতঃপর আরো বলেনঃ "তোমরা ভাল জিনিসের পরিবর্তে খারাপ বা বাতিল জিনিস দিবে না" (৪ঃ৩)। অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা যেমন অবৈধ, তেমনই মন্দ জিনিস বিক্রয় করা বা ভালোর পরিবর্তে মন্দ দেওয়াও অবৈধ।

এই আয়াতগুলিতে খোদাতা'লা অসততার যাবতীয় দিক বর্ণনা করিয়াছেন এবং এরূপ পরিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, যাহার পর অসততার কোন দিক আলোচনার বাকী নাই। শুধু এই কথাই বলেন নাই যে, চুরি করিও না, যাহার ফলে কোন নির্বোধ যেন মনে না করে যে, চুরি করা তাহার জন্য হারাম, কিন্তু অন্য সকল প্রকার অবৈধ উপায় হালাল। এই পূর্ণাঙ্গীন উপদেশ দ্বারা যাবতীয় অবৈধ উপায়কে নিষিদ্ধ নির্ধারণ করার মধ্যে সেই প্রজ্ঞাই নিহিত আছে। বস্তুতঃ যদি কেহ সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি

দিয়া সততা ও বিশ্বস্ততা সম্বলিত এই চরিত্রগুণ নিজের মধ্যে না পায় এবং ইহার সব দিক পালন না করে, তবে সে আমানত-দিয়ানতের কোন কোন বিষয়ে সৎকর্ম করিলেও, ইহা তাহার নৈতিক গুণ ও সততা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। বরং উহা বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান বিবর্জিত এক স্বাভাবিক অবস্থা হইবে মাত্র।

অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিক গুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে 'হুদ্‌না' ও 'হাউন' বলে। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যুলুম করিয়া কাহাকেও দৈহিক কষ্ট না দেওয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সহিত জীবন যাপন করা।" ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং ইহা মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক। এই নৈতিক গুণের উপযোগী মানব শিশুর মধ্যে যে প্রকৃতিগত শক্তি থাকে, যাহা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া খুলক্ বা নৈতিক গুণে পরিণত হয়, উহা হইতেছে উলফত (الفت), অর্থাৎ, সুশীলতা। ইহা সুস্পষ্ট যে, শুধু স্বভাবজ অবস্থায়, যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষ হয় না, তখন সে শান্তি কি, বা সংঘাত কি, কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং, তখন তাহার মধ্যে মিলামিশার যে অভ্যাস পাওয়া যায়, উহাই শান্তিপ্রিয়তা অভ্যাসের এক শিকড়। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বিশেষ মননশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় না বলিয়া ইহা খুল্‌ক বা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত তখনই হইবে, যখন মানুষ আকাঙ্খা দ্বারা আপনাকে নিরুপদ্রব রূপে গড়িয়া তুলিয়া শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করিবে এবং অযৌক্তিক ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এই শিক্ষা দেন ঃ

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ (সূরা আনফাল 8 : 2)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ (সূরা নিসা, 4 : 129)

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (সূরা আনফাল 8 : 62)

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا (সূরা ফুরকান,25 : 64)

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ○ (সূরা ফুরকান, 25 : 73)

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ○

(সূরা ফুসসিলাত, 41 : 35)

অর্থাৎ, "পরস্পর সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিবে (৮ঃ২)। সদ্ভাবেই মঙ্গল নিহিত (৪ঃ১২৯)। অন্যেরা শান্তি স্থাপন করিতে চাহিলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হইবে (৮ঃ৬২)। খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সহিত পৃথিবীতে চলেন (২৫ঃ৬৪)। যদি তাহারা কাহারও মুখে কোন বৃথা কথা শোনে, যাহা সংঘাতের সূচনা করে এবং বিবাদের ভূমিকা হয়, তাহা হইলে তাহারা গাম্ভীর্যের সহিত উহাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় (২৫ঃ৭৩) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া লড়াই আরম্ভ করে না।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেওয়া না হয়, হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে তাহারা ভালোবাসে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের ইহাই নীতি। ছোট খাট বিষয়কে কোন গুরুত্ব দেবে না। ক্ষমা করিবে। এই আয়াতে 'লাগ্‌ব' (لغو) শব্দ আছে। জানা আবশ্যক যে, আরবীতে লাগ্‌ব (لغو) বলিতে সেইরূপ ক্রিয়াকলাপকে বলে, যেমন কোন ব্যক্তি কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুষ্টামি করিয়া উস্কানিমূলক কথা বলে, যদ্বারা কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় না। সুতরাং শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ এই যে, এই প্রকার বৃথা কষ্টদানে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। কিন্তু কষ্ট দান যদি শুধু লাগব্-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তদ্বারা প্রকৃতই প্রাণ, ধন-সম্পদ বা সম্মান আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য, এই প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিলে ইহাকে সেই নৈতিক গুণ বলা হইবে যাহার নাম আফ্‌উ (عفو)। (এই বিষয়ে ইন্‌শা-আল্লাহ্ পরে আলোচনা করা হইবে) অতঃপর বলা হইয়াছেঃ "দুষ্টামি করিয়া কেহ বাজে কথা বলিলে তোমরা তাহাকে সৎভাবে শান্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তখন এই আচরণে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হইবে" (৪১ঃ৩৫)। বস্তুতঃ শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখিতে গিয়া অন্যায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার সীমা শুধু ঐ পর্যন্তই হইবে যদ্বারা প্রকৃতই কোন অনিষ্ট হয় না এবং শত্রুর কেবল বৃথাই বাক্য ব্যয় হয়।

অকল্যাণ বর্জনের চতুর্থ প্রকার 'খুল্‌ক' হইল (رِفْق) নম্রতা ও (قولِ حسن) সদালাপ। এই নৈতিক গুণ যে স্বভাবজ অবস্থা হইতে সৃষ্টি হয়,

উহাকে বলে তালাকত (طلاقت) অর্থ, প্রফুল্ল-চিত্ততা। শিশু যতদিন কথা বলিতে পারে না, ততদিন সে নম্রতা ও উত্তম বাক্যের স্থলে প্রফুল্ল-চিত্ততা প্রদর্শন করে। ইহাই একথার প্রমাণ যে, নম্রতার মূল, যেখান হইতে এই বৃক্ষ জন্মায়, উহা তালাকত। তালাকত (প্রফুল্ল-চিত্ততা) একটা শক্তি এবং নম্রতা একটি নৈতিক গুণ, যাহা এই শক্তিকে যথাস্থানে ব্যবহারে সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে খোদাতা'লার শিক্ষা এই ঃ

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا (সূরা বাকারা 2: 84)

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ

(সূরা হুজুরাত, 49 : 12)

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○ (সূরা হুজুরাত, 49 : 13)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○ (সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 37)

অর্থাৎ,"লোকের নিকট ঐ কথাই বলিবে, যাহা প্রকৃতপক্ষে ভাল(২ঃ৮৪)। এক জাতি অন্য জাতিকে উপহাস বা নিন্দা করিবে না। হইতে পারে যাহাদিগকে উপহাস করা হয়, তাহারাই ভাল। কোন স্ত্রী লোক কোন স্ত্রীলোককে ঠাট্টা করিবে না। হইতে পারে যাহাকে ঠাট্টা করা হয়, সেই ভাল। কাহারও দুর্নাম করিবে না। আপন জনের খারাপ নামকরণ করিবে না (৪৯ঃ১২)। সন্দেহের বশে কিছু বলিবে না। কখনও খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া দোষ জিজ্ঞাসা করিবে না। একে অন্যের কিছু কুৎসা করিবে না (৪৯ঃ১৩)। কাহারও বিরুদ্ধে সেই অপবাদ সৃষ্টি বা অভিযোগ আনয়ন করিবে না, যাহার কোন প্রমাণ তোমাদের নিকট নাই। স্মরণ

রাখিবে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে জবাবদিহি করিতে হইবে- কান, চক্ষু, অন্তর প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে" (১৭ঃ৩৭)।

কল্যাণ সাধনের উপায়সমূহ

অকল্যাণ পরিত্যাগের কথা বলা শেষ হইয়াছে এবং এখন আমরা 'ইসালে খায়ের' বা কল্যাণ সাধনের উপায়সমূহ বর্ণনা করিতেছি।

দ্বিতীয় প্রকার নৈতিক চরিত্রের গুণাবলী হইল কল্যাণ-সাধন সম্পর্কিত। তন্মধ্যে প্রথম নৈতিক গুণ হইল 'আফ্উ' (عفو)-অর্থাৎ কাহারো অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া। ইহাতে নিম্নরূপ কল্যাণ সাধিত হয়। এক ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় বা তাহার ক্ষতি সাধন করে বলিয়া সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত। এই শাস্তি আইনের মাধ্যমে দেওয়া যাইতে পারে। অপরাধীর জেল-জরিমানা হইতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যভাবেও তাহাকে নিজে সরাসরি শাস্তি দিতে পারে। এমতাবস্থায়, অপরাধী ব্যক্তি ক্ষমা দ্বারা সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হইলে, যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়েরই হিত-সাধন হইবে।

এক্ষেত্রে কুরআন শরীফের শিক্ষা হইল ঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ (সূরা আলে ইমরান, 3 : 135)

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ

(সূরা আশ্ শূরা 42 : 41)

অর্থাৎ, "তাহারা সাধু, যাহারা ক্রোধ দমন করিবার স্থানে তাহাদের ক্রোধ দমন করে এবং ক্ষমার উপযোগী ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে (৩ঃ১৩৫)। অন্যায়ের প্রতিফলের পরিমাণ ততটুকুই যতটুকু অন্যায় করা হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে এবং এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমা করে যে, তাহাতে অপরাধীর ইসলাহ্ (সংশোধন) হয় এবং তাতে কোন অমঙ্গল সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ, ক্ষমা যদি সঠিক ক্ষেত্রে করা হয়, তাহা হইলে ক্ষমাকারী ইহার পুরস্কার পাইবে" (৪২ঃ৪১)।

এই আয়াতে বর্ণিত কুরআনী শিক্ষা ইহা নহে যে, উচিত অনুচিত সব ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা এবং দুষ্ট ও অত্যাচারীদিগকে শাস্তি না দেওয়া। বরং শিক্ষা এই যে, ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, না শাস্তির যোগ্য তাহা বিবেচনা করিয়া অপরাধীদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য যাহা প্রকৃতই মঙ্গলজনক, সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষমার ফলে, অপরাধী তওবা (প্রত্যাবর্তন) করে এবং কোন কোন অপরাধী ক্ষমার ফলে আরো দুঃসাহসী হয়। সুতরাং, খোদাতা'লা বলেন, অন্ধের ন্যায় শুধুই অপরাধ ক্ষমার অভ্যাস করিবে না, বরং অভিনিবেশ সহকারে দেখিবে যে, প্রকৃত পুণ্য কোথায়, ক্ষমায়, না শাস্তি দেওয়ায়? সুতরাং, যাহা ক্ষেত্রপোযোগী, তাহাই করিবে। ব্যক্তির দিক হইতে মানুষকে দেখিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোন কোন মানুষ অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া থাকে। এমন কি তাহারা পিতামহ, প্রপিতামহের আমলের প্রতিহিংসাও স্মরণ রাখে। তেমনই কোন কোন মানুষ ক্ষমা করা ও অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার অভ্যাসে একেবারে চরমে পৌঁছায়। অনেক সময় এই অভ্যাসের সীমা মহা নির্লজ্জতায় পৌঁছায় এবং এমন লজ্জাস্কর বিষয়েও ক্ষমা দেখায় ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে , যাহা কুকাজের প্রতি ঘৃণা, আত্মসম্মান, চরিত্রের পবিত্রতা ও সতীত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমনকি তাহা সাধু জীবনের উপর কলঙ্ক আনয়ন করে। এইরূপ ক্ষমা ও অন্যায়ের প্রতি এইরূপ উপেক্ষা দর্শনে সকলেই ধিক্কার দিতে বাধ্য হয়। এই সকল অপকারিতার কারণে কুরআন করীম প্রত্যেক নৈতিক গুণের জন্য ক্ষেত্র ও সময়ের শর্ত বাঁধিয়া দিয়াছে এবং অস্থানে, অসময়ে, অপাত্রে প্রকাশিত কোন নৈতিক গুণকে কুরআন মঞ্জুর করে না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্ষমা মাত্রই নৈতিক গুণ বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে না। উহাকে স্বভাবজ শক্তি বলা যাইতে পারে । ইহা শিশুদের মধ্যেও পাওয়া যায়। শিশুকে কেহ দুষ্টামি করিয়াও আঘাত করিলে, শিশু অল্পক্ষণ পরেই ভুলিয়া যায় এবং পুনরায় সাদরে তাহার নিকট যায়। এইরূপ, মানুষ তাহাকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া থাকিলেও সে শুধু মিষ্টি কথায় তুষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, এইরূপ ক্ষমা কোন প্রকারেই নৈতিক

গুণের অন্তর্গত নহে। কোন গুণ তখনই নৈতিক বলিয়া গণ্য হইবে, যখন আমরা উহাকে ক্ষেত্র বা কাল অনুযায়ী ব্যবহার করিব। নচেৎ ইহা একটি স্বভাবজ প্রবণতা হিসাবেই বিবেচিত হইবে। পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি খুব কমই আছে, যাহারা স্বভাবজ শক্তি ও নৈতিক গুণের মধ্যে তারতম্য করিতে পারে। আমরা বার বার বলিয়াছি, প্রকৃত নৈতিক গুণের সহিত সর্বদা ক্ষেত্র ও কালের সম্বন্ধ থাকে। স্বভাবজ শক্তি অস্থানেও প্রকাশিত হয়। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গাভী এবং ছাগ নিরীহ প্রাণী, কিন্তু একই কারণে ইহাদেরকে নৈতিক গুণে ভূষিত বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। কেননা ইহাদিগকে ক্ষেত্র ও কাল বিচারের বুদ্ধি দেওয়া হয় নাই। খোদার প্রজ্ঞা এবং খোদার সত্য ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রত্যেক নৈতিক গুণের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের শর্ত আরোপ করিয়াছে।

কল্যাণ সাধন সম্পর্কিত নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় হইতেছে ন্যায়- পরায়ণতা (عدل) তৃতীয় কৃপা (احسان) এবং চতুর্থ আত্মীয়তা সুলভ ঔদার্য, (ذی القربیٰ) যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ

(সূরা নহল, 16 : 91)

"আল্লাহ্ তা'লার আদেশ, পুণ্যের বদলে পুণ্য কর এবং যদি আদ্‌ল (ন্যায়পরায়ণতা) হইতে বাড়িয়া এহ্‌সান (দয়া-পরোপকারী) করার সুযোগ ও ক্ষেত্র পাও, তাহা হইলে সেখানে এহ্‌সান কর এবং যদি এহ্‌সান হইতে বাড়িয়া আত্মীয়সুলভ স্বভাবজ আবেগে কল্যাণ করার ক্ষেত্র পাও, তাহা হইলে সে স্থানে স্বভাবজ সহানুভূতিতে কল্যাণ কর। খোদাতা'লা তোমাদিগকে স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগীতার সীমা লংঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিবেক যেখানে সায় দেয় না, সেখানে এহ্‌সান করা, কিংবা যেখানে সায় দেয় সেখানে এহ্‌সান না করা, কিংবা যোগ্য ক্ষেত্রে আত্মীয়সুলভ করুণা প্রদর্শনে বিরত থাকা, মহান আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন। আবার বাড়াবাড়ি করিয়া অযথা করুণা প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করিয়াছেন" (১৬ঃ৯১)। এই আয়াতে কল্যাণ বা কল্যাণ সাধনের ইসালে খায়রের তিনটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম স্তর হইল কল্যাণের বদলে কল্যাণ করা। ইহা নিম্নস্তর এবং নিম্নস্তরের ভাল মানুষও এই গুণ অর্জন করিতে পারে। মানুষ তাহারই মঙ্গল করে, যে তাহার মঙ্গল করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। উহা এই যে, প্রথমেই নিজে পুণ্য করা এবং কাহারাও প্রাপ্য ছাড়াই তাহার প্রতি এহ্সান করিয়া উপকার করা। ইহা মধ্যবর্তী স্তরের গুণ। অধিকাংশ লোক গরীবদের প্রতি এহ্সান (দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকার) করিয়া থাকে। এহ্সানের মধ্যে এক গুপ্ত ত্রুটি থাকে। এহ্সানকারী মনে করে যে, সে এহ্সান করিয়াছে এবং সে কমপক্ষে তাহার এহ্সানের বদলে কৃতজ্ঞতা বা দোয়া কামনা করে। যদি এহ্সান প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহার বিরোধী হইয়া যায়, তখন সে তাহাকে অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেয়। কখনও কখনও এহ্সানপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর ক্ষমতাতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দেয় এবং স্বীয় এহ্সান স্মরণ করায়। আল্লাহ্ তা'লা এহ্সানকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন ঃ

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ (সূরা বাকারা, 2 : 265)

"হে এহ্সানকারীগণ! তোমাদের সদ্কা সমূহের ভিত্তি অকপটতার উপর হওয়া চাই। এহ্সানসমূহকে স্মরণ করাইয়া মনে দুঃখ দিয়া, উহার পুণ্যকে ধ্বংস করিও না (২ঃ২৬৫)।" সদ্কা শব্দটি সিদ্ক (অকপট) হইতে উদ্ভূত। সুতরাং যদি হৃদয়ে সিদ্ক এবং এখলাস (নিষ্ঠা) না থাকে, তাহা হইলে সেই সদ্কা আর সদ্কা থাকে না, বরং উহা কপটতার কাজ হইয়া থাকে। অতএব এহ্সানকারীর মধ্যে এক ত্রুটি থাকে যে, সে কখনও ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় এহ্সান স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই জন্য খোদাতা'লা এহ্সানকারীগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

কল্যাণ সাধনের তৃতীয় পর্যায় সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলেন যে, এহ্সান করার কথা একটুও স্মরণ করিবে না এবং কৃতজ্ঞতার প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করিবে না। বরং এমন এক সহানুভূতির প্রেরণা নিয়া পরোপকার করিবে, যেমন অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু স্নেহের আবেগেই মাতা পুত্রের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করেন। ইহা কল্যাণ সাধনের চূড়ান্ত পর্যায়, উহা ডিঙ্গাইয়া উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু

খোদাতা'লা কল্যাণ সাধনের এইসব বিভাগকেই স্থান-কাল-পাত্রের সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচনাধীন আয়াতে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, এই সদাচারগুলি যথাস্থানে ব্যবহার না হইলে, এইগুলি অনাচারে পরিণত হইবে। ন্যায়পরায়ণতা (عدل) অশ্লীলতায় (فحشاء) রূপান্তরিত হইবে। অর্থাৎ, সীমার বাহিরে গেলেই ইহা অপবিত্র রূপ ধারণ করিবে। তেমনি এহ্সান-এর পরিবর্তে মুন্কার এর রূপ প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ, বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক উহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহার স্বরূপ এমন হইয়া যাইবে যে, আত্মীয়-সুলভ মমতা বিদ্রোহে (بغی) পরিণত হইবে। অর্থাৎ, পরিস্থিতির অনুপযোগী সহানুভূতির আবেগ এক কুৎসিত অবস্থার সৃষ্টি করিবে। প্রকৃতপক্ষে, বাগই (بغی) শব্দ দ্বারা অতিবৃষ্টিকে বুঝায়, যাহা সীমার অধিক বর্ষণ করে এবং ক্ষেত্রসমূহকে ধ্বংস করে। আবার, ন্যায্য দাবীর খর্বতাকেও বাগ্ই বলা হয় এবং ন্যায্য দাবীর অধিকারের আধিক্যও বাগ্ই (بغی)।

বস্তুতঃ এই তিনটিই, সঠিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত না হইলে কুচরিত্রে পরিণত হইবে। এই জন্যই এই তিনটি গুণের সহিত স্থান-কাল-পাত্রের শর্ত লাগান হইয়াছে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল আদ্ল, কেবল এহ্সান, কেবল আত্মীয়-সুলভ ব্যবহার নৈতিক গুণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না বরং মানুষের মধ্যে এইগুলি সবই স্বভাবজাত অবস্থা এবং প্রকৃতিগত শক্তি, যাহা শিশুর মধ্যেও জ্ঞান উন্মেষের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নৈতিক গুণ হওয়ার জন্য বুদ্ধি বিবেচনা ও বিবেক প্রয়োগের শর্ত বিদ্যমান। আরো শর্ত এই যে, প্রত্যেক সহজাত শক্তিকে সঠিক ক্ষেত্রে ও সঠিক সময়ে ব্যবহার করিতে হইবে।

এহ্সান সম্বন্ধে কুরআন শরীফে আরও জরুরী নির্দেশ বা হেদায়াতসমূহ রহিয়াছে। ঐ সবগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পূর্বে (الف لام) 'আল্' শব্দ ব্যবহার করিয়া স্থান-কাল-পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

যেমন, তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ (সূরা বাকারা, 2 : 268)

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

(সূরা বাকারা, 2 : 265)

وَ اَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ (সূরা বাকারা, 2 : 196)

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا

عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○ (সূরা দাহ্‌র, 76 : 6-7)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ

اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ○ (সূরা দাহ্‌র, 76 : 9-10)

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ

السَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ (সূরা বাকারা, 2 : 178)

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

(সূরা ফুরকান, 25 : 68)

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ

سُوْٓءَ الْحِسَابِ ○ (সূরা রাদ, 13 : 22)

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○ (সূরা যারিয়াত, 51 : 20)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ (সূরা আলে ইমরান, 3 : 135)

وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً (সূরা রাদ, 13 : 23)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى

الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (সূরা তওবা, 9 : 60)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۭ (সূরা আলে ইমরান, 3 : 93)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 27)

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ○ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ (সূরা নিসা, 4 : 37-38)

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ ধন হইতে লোকদিগকে বদান্যতা, কৃপা বা সদকা ইত্যাদির আকারে দাও, যাহা তোমাদের পবিত্র উপার্জন।" অর্থাৎ যাহার মধ্যে চুরি, ঘুষ, গচ্ছিত ধনের তছরূফ বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অর্জিত সম্পদ, কিংবা যুলুম-লব্ধ টাকার মিশ্রণ নাই। অপবিত্র অর্থ হইতে দান করিবে, এই সংকল্প হইতে তোমাদের হৃদয় যেন দূরে থাকে (২ঃ২৬৮)। এবং দ্বিতীয় বিষয় এই যে, তোমাদের দান খয়রাত ও বদান্যতার খোঁটা দিয়া গ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়া পুণ্য করিবে না। অর্থাৎ, অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ইহা বা উহা দিয়াছ একথা কখনও বলিবে না এবং তাহাকে দুঃখ দিবে না। কারণ ইহার দ্বারা তোমাদের এহ্সান পণ্ড হইয়া যাইবে। আর এই পন্থাও অবলম্বন করিবে না যে, তোমরা তোমাদের অর্থ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় কর (২ঃ২৬৫)। খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি এহ্সান (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপকার) করিবে। কারণ খোদা এহ্সানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন (২ঃ১৯৬)। যাহারা প্রকৃত পরোপকার করে, তাহাদিগকে কর্পূর মিশ্রিত পানীয়ের পাত্র হইতে পান করান হইবে"(৭৬ঃ৬-৭)। অর্থাৎ, পার্থিব জ্বালা, হতাশা এবং অপবিত্র অভিলাষ তাহাদের হৃদয় হইতে দূরীভূত করা হইবে। কর্পূর 'কাফারা' (كَفَرَ) হইতে ব্যুৎপন্ন। আরবী ভাষায় كَفَرَ চাপা দেওয়া বা আবৃত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ তাহাদের অবৈধ উত্তেজনাসমূহকে দমিত করা

হইবে। এবং তাহারা পবিত্র-চিত্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা মা'রেফাতের (তত্ত্ব-জ্ঞানের) শীতলতা লাভ করিবে।

তারপর বলিয়াছেন ঃ "ঐ ব্যক্তিগণ (কিয়ামতে) সেই প্রস্রবণের পানি পান করিবে, যাহা তাহারা নিজের পুণ্য দ্বারা স্বহস্তে প্রবাহিত করিতেছে।" এখানে বেহেশ্‌ত তত্ত্বের এক গভীর রহস্যও ব্যক্ত হইয়াছে। যাহারা বুঝিতে চাহে, তাহারা বুঝিতে পারে। তারপর বলিয়াছেন ঃ প্রকৃত সাধু কর্মীদের স্বভাব এই যে, তাহারা শুধু খোদার প্রতি ভালবাসার কারণে, যে খাদ্য নিজেরা ভালবাসে, তাহাই মিসকীন, এতীম এবং কয়েদীগণকে খাওয়ায় এবং বলে, "আমরা তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতেছি না, বরং এই কাজ আমরা শুধু এই জন্য করিতেছি যে, খোদা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাঁহারই সন্তোষের জন্য এই খেদমত। আমরা ইহাও চাহি না যে, তোমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে" (৭৬ঃ৯-১০)। এই ইঙ্গিত এই কথার দিকে করা হইয়াছে যে, তৃতীয় প্রকারের যে কল্যাণ সাধন, যা শুধু সহানুভূতির আবেগেই করা হয় তাহারা সেই গন্তব্যই অবলম্বন করে। খাঁটি সাধুতার রীতি এই যে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে নিজের নিকটাত্মীয়দিগকে আপন অর্থ হইতে সাহায্য করে এবং এই অর্থ হইতে এতীমদের দায়িত্ব পালন, তাহাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে খরচ করিয়া থাকে এবং মিসকিনদিগকে দারিদ্র ও অনাহার হইতে রক্ষা করে, পথিক ও প্রার্থীদের সেবা করে এবং বন্দী ও দাসদের মুক্তির জন্য এবং ঋণীদের ঋণ-শোধের জন্যও তাহারা অর্থ দান করে (২ঃ১৭৮)। নিজ খরচের ব্যাপারে অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না (২৫ঃ৬৮)। বরং মিতাচার পালন করে, জোড়া দেওয়ার স্থানে জোড়া দেয় এবং খোদাকে ভয় করে (১৩ঃ২২)। তাহাদের ধনে প্রার্থী ও মূকদেরও অধিকার আছে (৫১ঃ২০)।" মূক অর্থে কুকুর, বিড়াল, পাখী, গো-মহিষ, গর্দভ, ছাগ ইত্যাদি জীবদেরকে বুঝায়। তাহারা অভাব ও অল্প আয়ের অবস্থায় এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে দানশীলতা সম্পর্কে হৃদয়কে কুণ্ঠিত করে না, বরং অভাবের সময়েও সাধ্যানুসারে দান করিতে থাকে (৩ঃ১৩৫)। কোন সময়ে তাহারা গোপনে দান করে এবং কোন সময়ে প্রকাশ্যে দেয় (১৩ঃ২৩)। কপটতা ও লোক দেখানো দান হইতে বাঁচার জন্য গোপনে দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যেও দান করে যাহাতে

অন্যেরাও প্রেরণা প্রাপ্ত হয়। খয়রাত ও সদ্‌কা প্রভৃতিতে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাহাতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রথমে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে। অবশ্য যারা খয়রাতের অর্থ আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বা উহার শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাহারাও খয়রাতের অর্থ হইতে কিছু পাইতে পারে। কাহাকেও মন্দপথ হইতে বাঁচাইবার জন্যও এই অর্থ হইতে কিছু দেওয়া যাইতে পারে। তেমনই দাস-মুক্তি (যুদ্ধবন্দী মুক্তি) ঋণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এবং অন্য প্রকারে, যাহা শুধু খোদার জন্য হয়, ঐ অর্থ খরচ হইবে (৯ঃ৬০)। তোমরা প্রকৃত সাধুতা কখনও লাভ করিতে পার না, যে পর্যন্ত না তোমরা মানবতার সহানুভূতিতে ঐ অর্থ ব্যয় কর যাহা তোমাদের নিকট প্রিয় (৩ঃ৯৩)। দরিদ্রের হক্ক আদায় কর, মিসকিনদিগকে দাও, পথিকদের সেবা কর এবং অপব্যয় হইতে আত্মরক্ষা কর (১৭ঃ২৭)।" অর্থাৎ, বিবাহ-শাদীতে এবং নানা প্রকার বিলাসিতার ক্ষেত্রে, সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে, রস্‌ম-রেওয়াজ (সামাজিক কদাচার) পালনে যত অপব্যয় করা হয়, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবে। "তোমরা মাতা-পিতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে। নিকট আত্মীয়, এতীম, মিসকিন এবং প্রতিবেশীর মধ্যে যাহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আত্মীয় নহে, পথিক, চাকর, ভৃত্য, ঘোড়া, ছাগল, গাভী, মহিষ এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত অন্য জীব-জন্তুর প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে। কারণ খোদা, যিনি তোমাদের সকলেরই খোদা, এই সব নিয়ম ও অভ্যাস পছন্দ করেন। তিনি বেপরোয়া ও স্বেচ্ছাচারীদিগকে ভালবাসেন না। তিনি এমন লোক চাহেন না, যাহারা নিজে কৃপণ এবং লোকদেরকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং নিজেদের অর্থ গোপন করে" (৪ ঃ ৩৭-৩৮)। অর্থাৎ, অভাবগ্রস্তকে বলে, আমাদের নিকট কিছু নাই।

প্রকৃত বীরত্ব

মানুষের সকল স্বভাবজ অবস্থাসমূহের মধ্যে শুজাআত (شجاعت) একটি অবস্থা, যাহা বীরত্বের অনুরূপ। দুগ্ধপায়ী শিশুও এই শক্তির কারণে কখনও কখনও অগ্নিতে হাত দিতে চায়। ইহা মানব-শিশুর স্বভাবজ অবস্থা। এই অবস্থা প্রথমে মানবস্বভাবের বিক্রমের ক্ষেত্রেও থাকে; মানুষ

ভীতি-প্রদর্শক কোন দৃষ্টান্ত হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করা পর্যন্ত কোন কিছুই ভয় পায় না। এই অবস্থায় মানুষ অকুতোভয়ে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে এবং বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করার জন্য বাহির হয়। লোকে ভাবে সে মহাবীর। কিন্তু ইহা শুধু একটা স্বভাবজ অবস্থা, যাহা হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও থাকে। বরং ইহা কুকুরের মধ্যে দেখা যায়। প্রকৃত বীরত্ব স্থান ও কালের সহিত সংবদ্ধ। উন্নত চারিত্রিক গুণ হইল সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত কাজের নাম, যাহা খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ (সূরা বাকারা, 2 : 178)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (সূরা রা'দ, 13 : 23)

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ (সূরা আলে ইমরান, 3 : 174)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ (সূরা আনফাল, 8 : 48)

অর্থাৎ, "তাহারাই বীর, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বা কোন বিপদ ঘটিলে যাহারা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না (২ঃ১৭৮)। তাহাদের জেহাদও কঠিন সময়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য হইয়া থাকে (১৩ঃ২৩)। তাহারা তাঁহার খোদার চেহারার নৈকট্যের অন্বেষণকারী হইয়া থাকে, বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নহে। তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় যে, লোকেরা তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একতাবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তোমরা লোকদেরকে ভয় কর। কিন্তু ভীতি প্রদর্শনে তাহাদের ঈমান আরও বর্ধিত হয় এবং তাহারা বলে ঃ খোদা আমাদের জন্য যথেষ্ট (৩ঃ১৭৪)। অর্থাৎ, তাহাদের বীরত্ব কুকুর ও হিংস্র জন্তুর ন্যায় নহে, যাহা শুধু স্বভাবজাত উত্তেজনার উপর নির্ভর করে এবং এক দিকে চলে। বরং তাহাদের বীরত্বের দুইটি দিক আছে। কখনও তাহারা আপন ব্যক্তিগত বীরত্ব দ্বারা নিজ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উহাকে দমন করে। আবার কখনও যখন দেখে যে, শত্রুর সহিত সংগ্রাম করাই সমীচীন,

তখন শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় নহে, বরং সত্যের সাহায্যের নিমিত্তে শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্বের ভরসায় নহে, বরং খোদার উপর ভরসা করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং তাহাদের বীরত্বে কোন কপটতা বা আত্মম্ভরিতা থাকে না এবং (তাহারা) অন্ধ প্রবৃত্তির অনুগমন করে না বরং সব দিক দিয়াই খোদার সন্তুষ্টিকেই অগ্রগণ্য রাখে" (৮ঃ৪৮)।

এই আয়াতগুলিতে ইহা বুঝান হইয়াছে যে, প্রকৃত বীরত্বের মূল ধৈর্য ও স্থিরতা। প্রবৃত্তির যাবতীয় উত্তেজনা, কিংবা শত্রুবৎ বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় থাকা এবং কাপুরুষদের ন্যায় পলায়ন না করাই বীরত্ব। সুতরাং, মানুষের শৌর্য এবং হিংস্র জন্তুর সাহসিকতার মধ্যে প্রভেদ অনেক। পশু একটি দৃষ্টিকোণ দিয়া ক্রোধ ও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া কাজ করে। পক্ষান্তরে প্রকৃত বীরত্বসম্পন্ন মানুষ কোন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা অথবা সংগ্রাম ত্যাগ করা, যাহা সমীচীন, তাহাই করে।

সত্যবাদিতা

মানুষের স্বভাবজাত অবস্থাসমূহের মধ্যে সত্যবাদিতা তাহার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক কোন স্বার্থবোধ তাহাকে প্ররোচণা না যোগায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলিতে চায় না এবং মিথ্যা আশ্রয় লইতে হৃদয়ে এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এই কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচারণ প্রমাণিত হয়, মানুষ তাহার প্রতি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু এই স্বভাবজ অবস্থা নৈতিকতার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেননা, শিশু এবং পাগলও উহা পালন করিতে পারে। সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত না মানুষ হীন বাসনা, স্বার্থবোধ, ক্ষতির ভয়, সম্মানের ভয় ইত্যাদি বিষয় জলাঞ্জলি দেয় যাহা তাহার সত্যবাদীতায় বাধা সৃষ্টি করে, সেই পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হইতে পারে না। কারণ মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্য কথা বলে যাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু মান-সম্মান বিপন্ন হইলে বা ধন-সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা কথা বলে এবং সত্য বলিতে পরান্মুখ হয়, তবে সেক্ষেত্রে পাগল ও শিশু

অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কি? পাগল ও নাবালক শিশু কি এই প্রকার সত্য বলে না? পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এমন কেহই নাই যে কোন প্ররোচনা ছাড়া অকারণে মিথ্যা বলে। অতএব, যে সত্যবাদিতা কোন ক্ষতির আশঙ্কার সময়ে ত্যাগ করা হয়, তাহা প্রকৃত নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কখনও গণ্য হইতে পারে না। সত্যবাদিতা প্রমাণের ইহাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও কঠিন সময় ও ক্ষেত্র, যখন নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ বা সম্মান বিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে খোদার শিক্ষা হইল ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ

(সূরা হজ্জ, 22 : 31)

وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ (সূরা বাকারা, 2 : 283)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ (সূরা বাকারা, 2 : 284)

وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ (সূরা আন-আম, 6 : 153)

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ (সূরা নিসা, 4 : 136)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ (সূরা মায়েদা, 5 : 9)

وَالصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ (সূরা আহ্যাব, 33: 36)

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۧ (সূরা আসর, 103 : 4)

لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ (সূরা ফুরকান, 25 : 73)

অর্থাৎ "প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাবাদিতা হইতে বিরত হও (২২ঃ৩১)।" অর্থাৎ, মিথ্যাও এক প্রতিমা। ইহার উপর ভরসাকারী খোদার উপর ভরসা করা ছাড়িয়া দেয়; সুতরাং মিথ্যা বলায় তাহাকে খোদাকে হারাইতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আবার বলিয়াছেনঃ "যখন তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহূত হও, যাইতে অস্বীকার করিও না (২ঃ২৮৩) এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে সত্য গোপন করে তাহার হৃদয় পাপী (২ঃ২৮৪)।

যখন তোমরা বল, তখন ঐ কথাই বলিবে, যাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা এবং ন্যায় বিচারের সাক্ষ্য দান করিও না। যে সত্য গোপন করে তাহার হৃদয় পাপী (২ঃ২৮৪)। যখন তোমরা বল, তখন ঐ কথাই বলিবে, যাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা এবং ন্যায় বিচারের কথা (৬ঃ১৫৩)। কোন নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতে হইলেও সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার জন্য হওয়া উচিৎ। মিথ্যা বলিবে না, যদিও সত্য বলায় তোমাদের প্রাণের ক্ষতি হয়, তোমাদের মাতা-পিতার অনিষ্ট হয়, কিংবা অন্য নিকটাত্মীয় ব্যক্তি, যেমন পুত্র পরিজন ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৪ঃ১৩৬)। কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে সত্য সাক্ষ্য দানে প্রতিরোধ না করে (৫ঃ৯)। সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যপরায়ণা স্ত্রীলোক মহাপুরস্কার লাভ করিবে (৩৩ঃ৩৬)। তাহাদের আচরণ অন্যকেও সত্যপরায়ণতার উপদেশ ও উৎসাহ দেয় (১০৩:৪), এবং মিথ্যাবাদীদের আসরে তাহারা বসে না" (২৫:৭৩)।

সব্‌র বা ধৈর্য

মানুষের স্বভাবজ বিষয়সমূহের মধ্যে সব্‌র বা ধৈর্য অন্যতম। বিপদাপদ, রোগ-শোক ও দুঃখ-কষ্ট মানুষের নিত্য সহচর। সময়ে তাহাকে ধৈর্য ধারণ করিতে হয়। মানুষ অনেক উদ্বেগ, অস্থিরতা, কান্না-কাটি ইত্যাদির পর অবশ্য ধৈর্য ধারণ করে। কিন্তু জানা আবশ্যক, খোদাতা'লার পবিত্র গ্রন্থের দিক হইতে এই ধৈর্য নৈতিকতার অন্তর্গত নহে। বরং উহা এমন একটা অবস্থা, যাহা ক্লান্তির পর আপনা আপনিই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবজ আচরণের মধ্যে ইহাও একটি অবস্থা। বিপদ উপস্থিত হইলে, প্রথম প্রথম সে কাঁদে, চিৎকার করে, মাথা ঠুকে, অবশেষে অনেক আবেগ প্রকাশের পর উত্তেজনার উপশম হয়, চরমে পৌঁছাইয়া পিছাইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এই উভয় অবস্থাই প্রাকৃতিক। নৈতিক গুণের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বরং এই সম্পর্কিত নৈতিক গুণ হইল- যখন কোন জিনিস হস্তচ্যুত হইতে থাকে, তখন ঐ জিনিস খোদাতা'লার আমানত বা গচ্ছিত সামগ্রী মনে করিয়া কোনও প্রকার অভিযোগ করিবে না এবং

বলিবে, 'যাহা খোদার ছিল, উহাই খোদা লইয়াছেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট।' এই নৈতিক গুণ সম্বন্ধে খোদাতা'লার পবিত্র কালাম কুরআন শরীফ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

(সুরা বাকারা, 2 : 156-58)

অর্থাৎ, "হে মোমেনগণ, আমরা তোমাদিগকে এই প্রকারে পরীক্ষা করিতে থাকিব যে, কখনও তোমরা কোন ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হইবে, কখনও দারিদ্র্য ও অনশন তোমাদিগকে ক্লিষ্ট করিবে, কখনও তোমাদের অর্থ-হানি ঘটিবে, কখনও জীবন বিপন্ন হইবে, কখনও তোমাদের শ্রম বিফল হইবে এবং চেষ্টার বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে না, কখনও তোমাদের সন্তান বিয়োগ ঘটিবে। কিন্তু তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও, যখন তাহাদের বিপদ ঘটে, তখন তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য, আমরা তাঁহার আমানত, তাঁহারই করায়ত্ত। সুতরাং ইহাই সুসঙ্গত যে, আমরা যাহার আমানত, তাঁহারই নিকট আমাদের প্রত্যাগমন। ইহাদেরই উপরে খোদার আশিস রহিয়াছে এবং ইহারাই খোদার পথ প্রাপ্ত হইয়াছে" (২ঃ১৫৬-১৫৮)।

বস্তুতঃ এই চারিত্রিক গুণের নাম ধৈর্য এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্টি। অধিকন্তু, এক হিসাবে এই নৈতিক গুণের নাম ন্যায়পরায়ণতা। কারণ, যখন খোদাতা'লা মানুষের জীবন ব্যাপীয়া তাহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন এবং সহস্র সহস্র বিষয় তাহার ইচ্ছামত প্রকাশ করেন এবং মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তাহাকে এত সব নেয়ামত দান করিয়াছেন যে, মানুষ তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন ইহা কি ন্যায়-বিচারের কথা হইবে যে, তিনি কখনও তাঁহার ইচ্ছাকে মানাইতে চাহিলে মানুষ পশ্চাদপদ হইবে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হইবে না, আপত্তি করিবে এবং ধর্মহীন ও বিপথগামী হইবে?

সহানুভূতি

মানুষের স্বাভাবিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় সহজাত অবস্থা আছে, উহা হইল সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতির আবেগ। স্বজাতির পক্ষ সমর্থনে উৎসাহ ও প্রেরণা স্বভাবতই প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষ স্বজাতি-প্রীতির স্বভাবজ উত্তেজনায় বিজাতিগণের উপর যুলুম করিয়া বসে। দেখিলে মনে হয়, তাহারা অন্যদের মানুষ বলিয়া গণ্য করে না। সুতরাং এই অবস্থাকে নৈতিক গুণ বলা যায় না। ইহা কেবল একটা প্রকৃতিদত্ত উত্তেজনা। চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই স্বভাবজ অবস্থা কাক প্রভৃতি পক্ষীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। একটি কাকের মৃত্যুতে সহস্র সহস্র কাক জমা হয়। কিন্তু এই অভ্যাস মানব চরিত্রে নৈতিকতার রূপ তখনই ধারণ করে, যখন এই সহানুভূতি ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার সমর্থিত পন্থায় সঠিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ মোতাবেক প্রকাশিত হয়। তখন ইহা এক মহান চারিত্রিক গুণ হইয়া যায়। আরবীতে ইহা 'মাওয়াসাত' (مواسات) এবং ফারসীতে হামদর্দী নামে পরিচিত। ইহারই প্রতি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে নির্দেশ করিতেছেন ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

(সূরা মায়েদা, 5 : 3)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ (সূরা নিসা, 4 : 105)

وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (সূরা নিসা, 4 : 106)

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

(সূরা নিসা, 4 : 108)

অর্থাৎ, "স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য শুধু পুণ্য কাজের ব্যাপারে করিতে হইবে। অত্যাচার ও সীমাতিক্রমের ব্যাপারে কখনও তাহাদের সাহায্য করিবে না (৫ঃ৩)। স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিতে সদা উৎসাহী থাকিবে। ক্লান্ত হইবে না (৪ঃ১০৫)। বিশ্বাস-ঘাতকদের পক্ষ

সমর্থনে লড়াই করিবে না (৪ঃ১০৬); যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা হইতে নিবৃত্ত হয় না খোদাতা'লা সেই বিশ্বাসঘাতকদের সহিত ভালবাসা রাখেন না" (৪ঃ১০৮)।

এক পরম উর্ধ্বতন অস্তিত্বের অন্বেষণ

মানুষের প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য স্বভাবজ অবস্থাবলীর অন্যতম অবস্থা হইতেছে এক পরম উর্ধ্বতন অস্তিত্বের অন্বেষণ, যাঁহার জন্য মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক নিভৃত আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অন্বেষণের লক্ষণ তখন হইতেই অনুভূত হওয়া শুরু হয়, যখন শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরের আলো বাতাসে আসে। কারণ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সর্বপ্রথম যে আত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তাহা হইল, সে মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং সে স্বভাবতঃ মায়ের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে। তারপর, যতই তাহার চেতনার বিকাশ হইতে থাকে এবং স্বভাবের কুঁড়ি যতই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে ততই তাহার মধ্যে সুপ্ত ভালবাসার আকর্ষণ ও উহার আপন রূপ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে প্রদর্শন করিতে থাকে। অতঃপর, তাহার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে মাতৃকোল ছাড়া আর কোথাও আরাম পায় না। তাহার পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য মাতৃঅঙ্গের আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। তাহাকে তাহার মাতার কাছ হইতে পৃথক করিয়া দূরে রাখিলে, তাহার সকল সুখ বিষাদে পরিণত হয়। তাহার সম্মুখে নানা প্রকার আনন্দ সম্ভার স্তূপীকৃত করা হইলেও, সে প্রকৃত আনন্দ আপন মাতৃক্রোড়েই দেখিতে পায় এবং তাহাকে ছাড়িয়া সে কোন কিছুতে আরাম পায় না। মায়ের প্রতি এই যে স্নেহের টানের সৃষ্টি হয়, তা কি জিনিস?

বস্তুতঃ ইহা সেই আকর্ষণ যাহা প্রকৃত উপাস্যের উদ্দেশ্যে শিশুর প্রকৃতিতে স্থাপন করা হইয়াছে। বরং সকল ক্ষেত্রেই যেখানে মানুষ প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন করে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে সেই আকর্ষণই কাজ করিতে থাকে। প্রত্যেক স্থানে সে যে প্রেমাবেগ ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে উহা সেই প্রেমেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ। অন্য কথায়, বিভিন্ন বস্তুসমূহকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সে এক হারান জিনিষের সন্ধান করিয়া ফিরে। উহার নাম সে এখন ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধন-সম্পদ, সন্তান বা স্ত্রীর

প্রতি অনুরাগ বা সুমিষ্ট গানের প্রতি তাহার প্রাণের আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে সেই হারান প্রেমাস্পদেরই অন্বেষণ। যেহেতু মানুষ সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তাকে, যিনি আগুনের মতই প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত এবং সকলেরই নিকট গুপ্ত, যাঁহাকে চর্মচক্ষে দেখিতে পারা যায় না, যাঁহাকে অসম্পূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা পাওয়া যায় না, সেই জন্য তাঁহাকে জানার ব্যাপারে মানুষ অনেক বড় বড় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। ভুল করিয়া তাঁহার প্রাপ্য অন্যদের দেওয়া হইয়াছে। খোদা এ ব্যাপারে কুরআন শরীফে বড়ই সুন্দর উপমা দিয়াছেন। পৃথিবী একটা শীশ্‌মহলের মত। উহার যমীনের ভিত অতি স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্মিত। অতঃপর, সেই স্ফটিকের নীচে পানি প্রবাহিত করা হইয়াছে, যাহা মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। যখন দৃষ্টি স্ফটিকের উপর পড়ে, তখন স্ফটিককে পানি বলিয়া ভ্রম হয়। এই অবস্থার মানুষ স্ফটিকের উপর দিয়া যাইতে সেইরূপ ভয় পায়, যেরূপ পানির উপর দিয়া যাইতে ভয় হয়। অথচ উহা প্রকৃতপক্ষে স্ফটিক, তবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তেমনিভাবে আকাশে যে সকল বৃহদায়তন গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ দেখা যায়, যথা সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি, এইগুলিও সেই স্বচ্ছ স্ফটিক; অথচ খোদা ভ্রমে সেগুলির পূজা করা হয়। ইহাদের তলদেশে এক মহাশক্তি কাজ করিতেছে। উহা কাঁচের আড়ালে পানির ন্যায় মহাবেগে প্রবাহিত। সৃষ্টির পূজারীগণ তাহাদের দৃষ্টিভ্রমের দরুন ঐ কাঁচগুলির উপরই সেই কর্মকে আরোপ করে, যাহা উহার তলদেশে অবস্থিত শক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। ইহাই নিম্নোক্ত আয়াতে করীমার তফসীর।

إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ (সূরা নমল, 27 : 45)

"নিশ্চয় উহা পালিশ করা কাঁচ নির্মিত মহল" (২৭ঃ৪৫)।

প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার অস্তিত্ব উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও একান্ত গুপ্ত। এই কারণে, তাঁহাকে জানার জন্য আমাদের চোখের সম্মুখস্থিত প্রাকৃতিক বিধান যথেষ্ট ছিল না। এই প্রকার বিধানের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ শত শত আশ্চর্যে ভরা এই সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসমন্বিত শৃঙ্খলাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আসিয়াছে। উপরন্তু জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং দর্শনে এরূপ মহাপান্ডিত্য অর্জন করিয়াছে, যেন আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা সন্দেহ ও সংশয়ের

অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নানা প্রকার ভ্রমের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে আর বাজে ও অমূলক কল্পনার বশবর্তী হইয়া দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। আর যদিওবা সেই অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহাদের কোন ভাবোদয় হইয়াও থাকে, তাহা শুধু এই পর্যন্ত যে, এই উচ্চাঙ্গীন ও উত্তম জড় বিধানকে দেখিয়া তাহাদের মনে হইয়াছে যে, প্রজ্ঞা পরিচালিত এই উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন শৃঙ্খলার এক স্রষ্টা থাকিতে হইবে। কিন্তু আসলে এই ধারণা অপূর্ণ এবং এই জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, এই কথা বলা যে, এই সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার জন্য একজন খোদার প্রয়োজন, কখনও ঐ কথার সমান নহে যে, ঐ খোদা প্রকৃতই আছেন। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের শুধু একটা আনুমানিক জ্ঞান, যাহা মনে প্রশান্তি আনিতে পারে না, সংশয়কেও মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসরণ করিতে পারে না। এবং ইহা এমন পানপাত্রও নহে, যাহা মানুষের স্বভাবজ সামগ্রিক জ্ঞান-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে। বরং এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, অনেক বাক্-বিতন্ডার পরেও পরিণাম তুচ্ছ এবং ফলশূন্যই থাকিয়া যায়।

সুতরাং খোদাতা'লা যেভাবে নিজের কর্মের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেইভাবে তিনি যে পর্যন্ত আপন অস্তিত্বকে আপন বাক্য দ্বারা প্রকাশিত না করেন, সে পর্যন্ত শুধু কর্ম প্রত্যক্ষ করিয়াই পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, যদি আমরা এমন কোন বদ্ধ কুঠরি দেখি যাহা আশ্চর্যজনকভাবে ভিতর হইতে রুদ্ধদ্বার থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থায় আমরা নিশ্চয় প্রথমে ইহা মনে করিব যে, ভিতরে কোন মানুষ আছে এবং সে ভিতরের দিক হইতে শিকল দিয়াছে। কারণ, বাহির হইতে ভিতরে শিকল দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী বৎসরের পর বৎসর যাবৎ বার বার ডাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তির দিক হইতে কোন সাড়া না আসিলে, ভিতরে কোন লোক থাকার পক্ষে যে সিদ্ধান্ত আমাদের ছিল, তাহা অবশেষে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং আমরা এই কথা মনে করিব যে, ভিতরে কেহ নাই। বিশেষ কোন কৌশলে ভিতরের শিকল আটকান হইয়াছে। এই অবস্থাই ঐ দার্শনিকগণের, যাহারা শুধু কাজ দেখিয়াই তাহাদের জ্ঞান সমাপ্ত করিয়াছে। ইহা বড়ই ভ্রান্তির কথা

যে, খোদাকে মৃতের ন্যায় মনে করা হয়, যেন তাঁহাকে কবর হইতে বাহির করাই কেবল মানুষের কাজ। খোদা যদি এমনই হইয়া থাকেন যে, মানুষের চেষ্টা তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, তবে এই প্রকার খোদা সম্বন্ধে আমাদের সব আশা ভরসাই বৃথা। বরং **খোদা তিনিই,** যিনি সর্বদা **আদি হইতে স্বয়ং** اَنَاالْمَوْجُوْد (**'আমি আছি'**) বলিয়া মানুষকে তাঁহার দিক আহ্বান করিয়া আসিতেছেন। ইহা অমার্জনীয় অপরাধ হইবে, যদি আমরা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হই যে, তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশে তাঁহার উপর মানুষের দয়ার অবদান রহিয়াছে। দার্শনিকরা না থাকিলে তিনি যেন চির নিখোঁজ রহিয়া যাইতেন। এবং একথা বলা যে,খোদা কি প্রকারে কথা বলিতে পারেন, তাঁহার কি জিহ্বা আছে? ইহাও এক ভয়াবহ দুঃসাহস। কারণ, তিনি কি জড় হস্ত ব্যতিরেকে যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্ররাজি এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেন নাই? তিনি কি ভৌতিক চক্ষু ব্যতীত জগতকে দেখেন না? তিনি কি দৈহিক কর্ণ ছাড়া আমাদের আওয়াজ শোনেন না? সুতরাং ইহা কি জরুরী নহে যে, তিনি কি এইভাবে কথাও বলেন? ইহা কখনও সত্য নহে যে, খোদার কথা বলা সম্মুখে নহে, পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার বাক্যালাপ ও সম্বোধনের উপর কোন কাল বা সময় নির্দিষ্ট করিয়া মোহর লাগাইতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্বের ন্যায় এখনও অন্বেষণকারীদেরকে ইলহামের প্রস্রবণ দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এখনও তাঁহার আশিসসমূহের দরজা তেমনি খোলা আছে, যেমন ইতিপূর্বে খোলা ছিল। অবশ্য, প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, শরীয়ত ও বিধান শেষ হইয়াছে এবং সকল রেসালত ও নবুওয়ত আপন উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়া, আমাদের নেতা ও প্রভু সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্তায় এসে চূড়ান্ত মার্গে উন্নীত হইয়াছে।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর আরবে আবির্ভূত হওয়ার তাৎপর্য

এই শেষ জ্যোতিঃ আরব হইতে প্রকাশিত হওয়াও তাৎপর্যহীন ছিল না। আরবগণ ঐ বনী ইসমাঈল জাতির লোক, যাহারা বনী ইসরাঈল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐশী প্রজ্ঞায় ফারান-এর মরুভূমিতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 'ফারান' শব্দের অর্থ দুই পলাতক অর্থাৎ যাঁহাদিগকে স্বয়ং

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বনী ইসরাঈল হইতে পৃথক করিয়াছিলেন, তওরাতের বিধানের মধ্যে যাঁহাদের কোন অংশ ছিল না। যেমন লিখিত আছে যে, ইস্‌হাকের সহিত ইসমাঈল কোন অংশের ভাগী হইবে না।

সুতরাং, যাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিল, তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। অন্য কাহারও সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কোন আত্মীয়তাও ছিল না। অন্য সব দেশেই এবাদত ও নিয়ম কানুনের মধ্যে কিছু কিছু প্রথা পাওয়া যাইত, যাহা হইতে সন্ধান মিলিত যে, অতীতের এক সময়ে তাহাদিগের নিকট নবীগণের শিক্ষা পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু শুধু আরব দেশই এরূপ ছিল, যাহা এইসব শিক্ষা হইতে একেবারেই অজ্ঞ ছিল এবং ইহা সমগ্র পৃথিবী হইতে পিছনে রহিয়া গিয়াছিল। এই জন্যই সর্বশেষে ইহার পালা আসিল। ইহার নবুওয়তকে সার্ব্বজনীন করা হইল, যাহাতে অন্যান্য সকল দেশকে ইহা পুনরায় আশিসমণ্ডিত করে এবং যে সকল ভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা দুর হইয়া যায়। সুতরাং এহেন পরিপূর্ণ গ্রন্থ– যাহা মানুষের ইস্‌লাহের (সংশোধনের) সকল কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা পূর্ববর্তী ধর্মীয় পুস্তকগুলির ন্যায় শুধু এক জাতির সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে না বরং সকল জাতির ইস্‌লাহ্‌ (সংশোধন) কামনা করে এবং মানবতার শিক্ষার সকল পর্যায় বর্ণনা করিয়াছে এবং অসভ্যদিগকে মানবোচিত আচরণ শিক্ষা দিয়াছে, তাহার পর আর কোন্‌ গ্রন্থের অপেক্ষা করিতে হইবে?

জগদ্বাসীর প্রতি পবিত্র কুরআনের অনুগ্রহ

কুরআনই সমগ্র বিশ্বের উপর এই এহ্‌সান বা কৃপা করিয়াছে যে, ইহা স্বভাবজ অবস্থা এবং উন্নত চরিত্রের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়াছে এবং ইহা স্বভাবজ অবস্থা হইতে বাহির করিয়া উন্নত চরিত্রের সবোর্চ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং আরও যে স্তরে উপনীত হইবার ছিল, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ পর্যন্ত পৌঁছনোার জন্য পবিত্র তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। শুধু উদ্‌ঘাটনই করে নাই, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে এইরূপে যে তিন প্রকার শিক্ষা লইয়া ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করিয়াছি, সেগুলিকে সুন্দরতমভাবে বর্ণনা করিয়াছে। সুতরাং, ধর্মীয় শিক্ষায় গড়িয়া তোলার জন্য যত প্রকার

শিক্ষার প্রয়োজন , সবই উহার মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া উহা এই দাবী করে যে, উহাই ধর্মীয় শিক্ষাকে পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। যেমন, খোদাতা'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ (সূরা ময়েদা, 5 : 4)

অর্থাৎ, "আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি" (৫ঃ৪)। অর্থাৎ, ধর্মের শেষ পর্যায় উহাই, যাহা 'ইসলামের' অর্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুধু খোদার জন্যই হইয়া যাওয়া এবং আপন মুক্তির প্রত্যাশা করা স্বীয় সত্তার কুরবানী দ্বারা, অন্য পন্থায় নহে, বরং উক্ত সংকল্প ও আকাঙ্খাকে কার্যতঃ প্রমাণ করিয়া দেখানোই হইল সেই কেন্দ্র বিন্দু যেখানে সর্বপ্রকার পরমোৎকর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

সুতরাং, যে খোদাকে দার্শনিকেরা সনাক্ত করিতে পারেন নাই, কুরআন সেই সত্য খোদার সন্ধান দিয়াছে। খোদার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান প্রদানের জন্য কুরআন দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রথম ঐ উপায়, যাহার মাধ্যমে যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের ফলে মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত শক্তিশালী ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং মানুষ ভুল হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় হইল রূহানী উপায়, যাহা আমরা তৃতীয় প্রশ্নের (মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং উহা লাভ করিবার উপায় কি) উত্তরে একটু পরেই ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা, আলোচনা করিব।

মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

এখন দেখ, যুক্তি-ভিত্তিক উপায়ে কুরআন শরীফ খোদার অস্তিত্বের কত উত্তম ও অতুলনীয় প্রমাণ পেশ করিয়াছে। যেমন, এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○ (সূরা ত্বহা, 20 : 51)

অর্থাৎ, "তিনিই হইতেছেন সেই খোদা, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে উপযোগী অবস্থা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর, সেই জিনিসকে উহার অভীষ্ট উন্নতি লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন" (২০ঃ৫১)। এখন এই আয়াতের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জল-স্থলের সকল প্রাণী ও পাখীর গড়নের প্রতি লক্ষ্য করিলে খোদার অসীম শক্তি বা কুদরত স্মরণে আসে। প্রত্যেক জিনিষের গড়ন উহার অবস্থার উপযোগী প্রতিভাত হয়। পাঠক, আপনি নিজেই চিন্তা করুন। কেননা, বিষয়টি খুব ব্যাপক।

দ্বিতীয় প্রমাণ, খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআন শরীফ খোদাতা'লাকে সব কারণের আদি কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছে। যেমন খোদা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۙ (সূরা নজম, 53 : 43)

অর্থাৎ, "কার্য ও কারণের সমগ্র শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট পৌঁছিয়া শেষ হয়"- (৫৩ঃ৪৩)। এই যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানিতে হইলে গভীর চিন্তার আবশ্যক। যত কিছু আছে সবই কার্য ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই জন্য পৃথিবীতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে। কেননা, সৃষ্টির কোন অংশ এই শৃঙ্খলের বহির্ভূত নয়। কোনটা কোনটার জন্য সূত্র এবং কোনটা শাখা বা প্রশাখা। ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন একটি কারণ হয় স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নয়তো উহার অস্তিত্ব অন্য কোন কারণ হইতে উদ্ভূত হবে। তারপর, দ্বিতীয় কারণ অন্য কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এই প্রকারেই সমগ্র শৃঙ্খল নির্মিত। ইহা হইতে পারে না যে, এই সসীম জগতে কার্য ও কারণের শৃঙ্খল কোথাও যাইয়া শেষ হইবে না। আর অসীম হইলেও প্রয়োজনের খাতিরে মানিতে হয় যে, এই শৃঙ্খল নিশ্চয় কোন না কোন শেষ কারণে পৌঁছাইয়া শেষ হইয়াছে। অতএব, এই সকল শৃঙ্খল যাঁহার কাছে গিয়া শেষ হইয়াছে তিনিই খোদা। চক্ষু মেলিয়া দেখ ঃ

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۙ (সূরা নজম, 53 : 43)

এই আয়াত সংক্ষিপ্ত কথায় কি সুন্দরভাবে উপরোল্লিখিত যুক্তি প্রদান করিতেছে! ইহার অর্থ, সব শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা পালনকর্তায় পৌঁছিয়া শেষ হইয়াছে।

তারপর, আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি আরও একটি যুক্তি দিয়াছেন। যেমন, বলিয়াছেন ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

(সূরা ইয়াসীন, 36 : 41)

অর্থাৎ, "সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, এবং চন্দ্রের প্রকাশকারী রাত্রি সূর্যের প্রকাশকারী দিনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে না" (৩৬ঃ৪১)। অর্থাৎ, ইহাদের কেহই আপন আপন নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে না। যদি পর্দার অন্তরালে ইহাদের কোন পরিচালক না থাকিত, তবে এই সমগ্র শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত। জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে গবেষণাকারীরা এই যুক্তি দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। কারণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এত বিশাল ও অগণিত গোলকপিণ্ড আছে যে, উহাদের সামান্য বিচ্যুতির ফলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির কী অপূর্ব মহিমা! ইহারা পরস্পর ধাক্কা খায় না, কেশাগ্র পরিমাণ গতি পরিবর্তন করে না। ইহারা এত দীর্ঘ কালব্যাপী কর্মরত থাকিয়াও বিন্দুমাত্র ঘর্ষিত হয় নাই। ইহাদের কল-কব্জার মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। উর্ধ্বে কোন রক্ষাকারী না থাকিলে কি প্রকারে এত বড় কারখানা অসংখ্য বর্ষব্যাপী আপনা-আপনি চলিতেছে? এইসব প্রজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করিয়া খোদাতা'লা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

(সূরা ইব্রাহীম, 14 : 11)

অর্থাৎ, "খোদার অস্বিত্ব সম্পর্কে কি করিয়া সন্দেহ হইতে পারে, যিনি এমন আকাশ-মন্ডল এবং এমন পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন? (১৪ঃ১১)

অতঃপর, তিনি তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়াছেন এবং উহা হইল ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

(সূরা রহ্‌মান, 55 : 27-28)

অর্থাৎ, "প্রত্যেক জিনিষ লয়শীল এবং যিনি অবিনশ্বর, তিনি হইলেন খোদা, মহাপ্রতাপান্বিত ও মহামর্যাদাবান" (৫৫ঃ২৭-২৮)। এখন দেখ, যদি আমরা ধরিয়া লই যে,পৃথিবী রেণু রেণু হইয়া যাইবে এবং নক্ষত্রনিচয় ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং উহাদের লয়ের নিমিত্ত এমন এক বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি হইবে যে, এই সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, তবু বুদ্ধি ও যুক্তি একথা মানিবে ও স্বীকার করিবে, বরং সুস্থ বিবেক ইহাই জরুরী জ্ঞান করিবে যে, এই সম্যক লয়ের পরেও একটা কিছু বাকী থাকিবে, যাহা লয় হইবে না, পরিবর্তন স্বীকার করিবে না এবং আপনার প্রথম অবস্থায় অবিকল থকিবে। অতএব তিনিই সেই খোদা, যিনি সমগ্র লয়শীল অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বয়ং লয়ের হস্ত হইতে নিরাপদ রহিয়াছেন।

তারপর, তিনি আরও এক প্রমাণ আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুরআন শরীফে পেশ করিয়াছেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ (সূরা আ'রাফ, 7 : 173)

অর্থাৎ, "আমি আত্মাদিগকে বলিলাম ঃ আমি কি তোমাদের প্রভু নহি? তাহারা বলিল ঃ কেন নহে"? (৭ঃ১৭৩)। এই আয়াতে খোদাতা'লা সংলাপের মাধ্যমে রূহের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আত্মার প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, কোন আত্মা উহার প্রকৃতির দিক হইতে খোদাতা'লাকে অস্বীকার করিতে পারে না। অস্বীকারকারীরা শুধু তাহাদের চিন্তায় প্রমাণ না পাওয়ায় অস্বীকার করে। কিন্তু এই অস্বীকার সত্ত্বেও তাহারা এ কথা স্বীকার করে যে, প্রত্যেক ঘটনার কারণ থাকে। কারণ ছাড়া কিছু ঘটে না। পৃথিবীতে এমন কোন অজ্ঞ নাই যে, দেহে কোন রোগ প্রকাশ পাইলে সে এই কথার উপর জোর দেয় যে, এই রোগের আড়ালে এই রোগ প্রকাশের কোন হেতু নাই। যদি বিশ্ব এই কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলভুক্ত না হইত, তবে ঘটনার পূর্বে কখনও এই প্রকার বলা সম্ভবপর হইত না যে, অমুক তারিখে তুফান হইবে, বা চন্দ্র

সূর্যের গ্রহণ হইবে, কিংবা অমুক সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইবে, অমুক সময়ে একটি ব্যাধির সহিত অমুক এক ব্যাধি আসিয়া সংযুক্ত হইবে। যদিও এই সব তত্ত্ববিদ খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তবু প্রকারান্তরে স্বীকার না করিয়া পারেন না যে, তাহারাও আমাদের মত ক্রিয়ার কর্তা, নিমিত্ত বা কারণ অন্বেষণ করেন। সুতরাং, ইহাও এক প্রকার স্বীকার, যদিও সম্পূর্ণ স্বীকার নয়। ইহা ছাড়া, যদি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা কোন নিরীশ্বরবাদীর চেতনা লোপ করা যায়, যেন সে এই হীন জীবনের চিন্তা ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ইচ্ছা শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া মহান সত্তার করতলগত হয়, তবে সে তদবস্থায় খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, অস্বীকার করিবে না। এ বিষয়ে বড় বড় গবেষকগণের সাক্ষ্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই অবস্থার প্রতিই উল্লিখিত আয়াতে ইঙ্গিত আছে। স্রষ্টার অস্তিত্বে 'অস্বীকার' শুধু ইতর হীন আসক্তির জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। নতুবা, মূল মানব প্রকৃতি 'স্বীকারে' ভরপুর।

মহান স্রষ্টার গুণাবলী

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই কয়েকটি যুক্তি নমুনা হিসাবে লিখিত হইল। অতঃপর ইহাও জানা আবশ্যক যে, যে খোদার দিকে আমাদিগকে কুরআন শরীফ আহ্বান করে, উহাতে তাঁহার নিম্নরূপ গুণাবলী লিখিত আছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○

(সূরা হাসর, 59 : 23)

مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ○ؕ

(সূরা ফাতেহা, 1 : 4)

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ

(সূরা হাসর, 59 : 24)

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○ۧ

(সূরা হাসর, 59 : 25)

عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○ۧ

(সূরা বাকারা, 2 : 21)

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ

(সূরা ফাতেহা, 1 : 2-4)

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ (সূরা বাকারা, 2 : 187)

اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ (সূরা বাকারা, 2 : 256)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

(সূরা ইখলাস, 112 : 2-5)

অর্থাৎ, "সেই খোদা এক অদ্বিতীয় ও অংশীবিহীন, তিনি ব্যতীত কেহই আরাধনার ও আনুগত্যের যোগ্য নহে" (৫৯ঃ২৩)। ইহা এই জন্যই বলিয়াছেন যে, তিনি অংশীবিহীন না হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার শক্তির উপর শত্রুর শক্তি প্রবল হইতে পারিত। এই অবস্থায় ঐশী মর্যাদা বিপন্ন হইত। এবং তিনি যে বলিয়াছেন ঃ **"তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য নাই,"** ইহার অর্থ হইল, তিনি এমন কামেল (পরিপূর্ণ) খোদা যাঁহার গুণাবলী ও কামালত এরূপ উচ্চ ও মহান যে, বিশ্ব চরাচরে কামেল গুণাবলীর জন্য কোন খোদার নির্বাচন করিতে চাহিলে, কিংবা মনে মনে শ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়তর এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কোন খোদার গুণাবলী কল্পনা করিতে গেলে, যাঁহাকে ছাড়াইয়া কেহ উত্তম হইতে পারে না, তিনিই আল্লাহ্, যাঁহার আরাধনায় কোন বস্তুকে শরীক করা অন্যায়। অতঃপর তিনি বলিয়াছেনঃ "তিনি আলেমুল গায়েব"। অর্থাৎ, তাঁহার সত্তাকে একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁহার সত্তাকে কেহ পরিবেষ্টন করিতে পারে না। চন্দ্র-সূর্য এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর আপাদ মস্তক আমরা দর্শন করিতে পারি, কিন্তু খোদার আপাদমস্তক দর্শনে আমরা অক্ষম। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন ঃ "তিনি আলেমুশ্ শোহাদাহ্"। অর্থাৎ কোন জিনিস তাঁহার দৃষ্টির অগোচর নহে। ইহা হইতে পারে না যে, তিনি খোদা বলিয়া অভিহিত হইয়া বস্তু জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি বিশ্বের অণু পরমাণু পর্যন্ত দেখেন। কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তিনি জানেন, কখন তিনি এই জগত বিধানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন এবং কেয়ামত আনিবেন এবং পুনরুত্থান ঘটাইবেন। তিনি ছাড়া কেহ জানে না যে, এরূপ কখন হইবে। সুতরাং, তিনিই খোদা যিনি

সকল প্রকারের সময়কেই জানেন। তিনি আবার বলিয়াছেন ঃ **"হুয়ার রহমান"**। অর্থাৎ তিনি প্রাণী সকলের অস্তিত্ব ও উহাদের কর্মের পূর্বে শুধু আপন দয়ায়, কোন স্বার্থের জন্য নহে বা কাহারও কর্ম ফলেও নহে, তাহাদের জন্য আরামের সামগ্রী যোগাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য ও পৃথিবী এবং অন্য সব জিনিষ আমাদের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আমাদের কর্মের অস্তিত্বের পূর্বে, আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দানের নাম খোদা নিজ গ্রন্থে রহমানীয়্যত এবং এই কাজের দিক হইতে নিজের নাম রহমান রাখিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন ঃ "আর্ রহীম"। তিনি খোদা, যিনি উত্তম কাজের উত্তম পুরস্কার দেন। কাহারও শ্রমকে নষ্ট করেন না। এই কাজের দিক হইতে তিনি রহীম এবং এই গুণের নাম রহীমীয়্যত। তারপর তিনি বলিয়াছেন ঃ "মালেকে ইয়াওমেদ্দীন" (১:৪)। অর্থাৎ "সেই খোদা প্রত্যেকের পুরস্কার বা শাস্তি স্বহস্তে ধারণ করেন"। তাঁহার এমন কার্য নির্বাহক নাই, যাহাকে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা সঁপিয়া দিয়া স্বয়ং পৃথক হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিজে কিছুই করেন না। এমনও নহে যে, সেই কার্য নির্বাহকই যত পুরস্কার ও শাস্তি দেয় বা ভবিষ্যতে দিবে। তারপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ (সূরা হাসর, 59 : 24)

আল্ মালেকুল কুদ্দুস"। অর্থাৎ "সেই খোদা বাদশাহ্, যাঁহার কোনই কলঙ্ক নাই" (৫৯ঃ২৪)। ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষের বাদশাহাত কলঙ্কহীন নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি কোন বাদশাহের সব প্রজা কষ্ট পাইয়া বা বিতাড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশ অভিমুখে পলায়ন করে, তবে তাহার বাদশাহী কায়েম থাকিতে পারে না। কিংবা যদি সব প্রজা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কোথা হইতে আসিবে? যদি প্রজাগণ বাদশাহের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দেয় যে, তাঁহার ও প্রজাদের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য আছে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের নিকট নিজের কি বিশেষ যোগ্যতা সাব্যস্ত করিবেন? বস্তুতঃ খোদাতা'লার বাদশাহী এ প্রকারের নহে। তিনি মুহূর্তে সব দেশ লয় করিয়া অন্য সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন। যদি তিনি এইরূপ ক্ষমতাবান স্রষ্টা ও শক্তিমান প্রতিপালক না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাদশাহাত নির্যাতন ছাড়া চলিতে পারিত

না। কারণ তিনি একবার বিশ্ববাসীকে ক্ষমা এবং মুক্তি দান করিয়া অন্য জগৎ কোথা হইতে আনিতেন? মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পৃথিবীতে পুনঃ প্রেরণের জন্য আবার ধর পাকড় ও নির্যাতনের পথে কি প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তিকে প্রত্যাহার করিতে হইত না? তদবস্থায়, তাঁহার ঐশী-কর্মকাণ্ডে পার্থক্য ঘটিত এবং তিনি পৃথিবীর বাদশাহ্গণের ন্যায় এক কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত বাদশাহ্ হইয়া পড়িতেন। যাহারা দেশের জন্য আইন-কানুন তৈরি করে, যাহারা কথায় কথায় বিগড়াইয়া যায় এবং নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন দেখিতে পায় যে, নির্যাতন ছাড়া গতি নাই, তখন তাহারা নির্যাতনকে মাতৃ-স্তনের দুধের ন্যায় মনে করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজকীয় আইনে একটি জাহাজকে বাঁচাইতে একটি নৌকার সকল আরোহীকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করাকে ও সত্য সত্যই বিনষ্ট করাকে, সিদ্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু খোদার পক্ষে এই প্রকার অসহায় হওয়া অনুচিত। সুতরাং যদি খোদা সর্বশক্তিমান ও অনন্তিত্ব হইতে সৃষ্টিকারী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি হয় দুর্বল রাজাদের ন্যায় মহিমার পরিবর্তে অত্যাচারের দ্বারা কাজ লইতেন, অথবা বিচারক হইয়া খোদায়ীকেই বিদায় দিতেন। পরন্তু খোদার জাহাজ সকল মহিমার সহিত প্রকৃত বিচারের উপরে চলিতেছে। তিনি আবার বলিয়াছেন, 'আস্সালাম' অর্থাৎ, সেই খোদা, যিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিপদ-আপদ ও কঠোরতা হইতে নিরাপদ, বরং শান্তিদাতা। ইহার অর্থও স্পষ্ট। কারণ যদি তিনি নিজেই বিপদগ্রস্ত হইতেন, লোকের হাতে মারা পড়িতেন এবং তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে এই মন্দ নমুনাকে দেখিয়া মন কি প্রকারে এই বলিয়া সান্তনা লাভ করিতে পারিত যে, এহেন খোদা আমাদিগকে নিশ্চয় আপদ মুক্ত করিবেন?

আল্লাহতা'লা মিথ্যা উপাস্যদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ (সূরা হজ্জ, 22 : 74-75)

"যে সব মানুষকে তোমরা খোদা বানাইয়া বসিয়া আছ, তাহারা সকলে মিলিয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতে চাহিলেও, কখনও তাহা পারিবে

না, এমনকি একে অপরকে সাহায্য করিলেও না। বরং যদি মাছি তাহাদের কোন জিনিষ ছিনাইয়া লইয়া যায়, তবে সেই মাছি হইতে সেই বস্তু ফেরৎ আনিবার শক্তিও তাহাদের হইবে না" (২২ঃ৭৪-৭৫)। তাহাদের উপাসকগণ বুদ্ধি ও শক্তিতে দুর্বল। খোদাতো তিনি, যিনি সকল শক্তিমান হইতেও অধিক শক্তিশালী এবং সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। কেহ তাঁহাকে ধরিতে বা বধ করিতে পারে না। যাহারা ভ্রমে নিপতিত, তাহারা খোদার মর্যাদা বুঝে না এবং জানে না যে, খোদা কেমন হওয়া উচিত। তারপর বলিয়াছেন ঃ

"খোদা শান্তি দাতা, স্বীয় কামালাত ও তৌহীদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকারী।"

ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, প্রকৃত খোদার মান্যকারী ব্যক্তি কোন মজলিসে লজ্জিত হইতে পারে না এবং সে খোদার সম্মুখেও লজ্জিত হইবে না। কারণ তাহার কাছে শক্তিশালী যুক্তি থাকে। কিন্তু কৃত্রিম খোদায় বিশ্বাসী বড়ই বিপদে থাকে। সে যুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে নিরর্থক আজেবাজে কথাকে গোপন তত্ত্ব আখ্যা দেয়, যাহাতে হাস্যাস্পদ হইতে না হয় এবং প্রমাণিত ভ্রান্তিসমূহকে ঢাকা দিতে চাহে। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ

(সূরা হাসর, 59 : 24)

অর্থাৎ "তিনি সকলের রক্ষক, পরাক্রমশালী, নষ্ট হওয়া কাজকেও সুসম্পন্নকারী; তাঁহার সত্তা চূড়ান্তভাবে অভাবের অতীত" (৫৯ঃ২৪)। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ

(সূরা হাসর, 59 : 25)

অর্থাৎ "তিনি এমন খোদা যে, তিনি সকল দেহেরও স্রষ্টা এবং সকল আত্মারও স্রষ্টা; গর্ভাশয়ে রূপশিল্পী তিনিই। যত ভাল ভাল নাম ধারণা করা সম্ভব, সব তাঁহারই" (৫৯ঃ২৫)। তিনি একই সঙ্গে আরও বলেন ঃ

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(সূরা হাসর, 59 : 25)

অর্থাৎ "আকাশ মন্ডলের অধিবাসীরাও তাঁহার নাম পবিত্রতার সঙ্গে স্মরণ করে এবং পৃথিবীর অধিবাসীরাও করে" (৫৯ঃ২৫)। এই আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে বসতি আছে এবং ঐ সকল অধিবাসীরাও খোদার হেদায়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। পুনরায় বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ (সূরা বাকারা, 2 : 149)

অর্থাৎ "খোদা সর্বশক্তিমান" (২ঃ১৪৯)। এই নাম উপাসকগণের জন্য বড়ই শান্তিপ্রদায়ক। কারণ, খোদা যদি দুর্বল হন এবং সর্বশক্তিমান না হন, তবে এরূপ

খোদার নিকট আমরা কি আশা করিব? তারপর বলেন ঃ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ

(সূরা ফাতেহা, 1 : 2-4)

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ (সূরা বাকারা, 2 : 187)

অর্থাৎ, "তিনিই খোদা, যিনি সকল জগতের পালনকর্তা, রহমান, রহীম এবং বিচার দিনের স্বয়ং মালিক। এই দিনের কর্তৃত্ব তিনি কাহারও হাতে দেন নাই। প্রত্যেক আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী এবং জবাবদানকারী। অর্থাৎ প্রার্থনামঞ্জুরকারী" (১ঃ২-৪, ২ঃ১৮৭)। আবার বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ (সূরা বাকারা, , 2 : 256)

অর্থাৎ, "সদা বিদ্যমান, সকল প্রাণের প্রাণ এবং সব অস্তিত্বের আশ্রয়" (২ঃ২৫৬)। ইহা বলার কারণ, তিনি অনাদি ও অনন্ত না হইলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা রহিত যে, আমাদের পূর্বেই না তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায়। তারপর বলেন ঃ "সেই খোদা এক অদ্বিতীয় খোদা। তিনি কাহারও পুত্র নহেন, এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে এবং কেহ তাহার স্বজাতীয় নহে" (১১২ঃ২-৫)।

স্মরণ রাখিতে হইবে, খোদাতা'লার তৌহীদ (একত্ব) সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাস রাখা এবং ইহাতে কম-বেশী না করাই হইল সঠিক বিচার, যাহা মানুষ তাহার প্রকৃত মালিকের সম্বন্ধে করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়

নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত যাহা কুরআন শরীফের শিক্ষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মুল সূত্র হইল, খোদাতা'লা সমগ্র নৈতিক গুণকে ঐ অবস্থায় নৈতিক গুণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, যখন উহা বাস্তব ও ন্যায্য সীমা অপেক্ষা কম বা অধিক না হয়। স্পষ্ট কথা, উহাই প্রকৃত সাধুতা, যাহা দুই সীমানার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ আধিক্য ও নূন্যতা এবং কম-বেশীর সীমানা অতিক্রম করার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। যে অভ্যাস মধ্যপন্থার দিকে আকৃষ্ট করে এবং মধ্যপন্থা কায়েম করে, উহাই উন্নত নৈতিকতা সৃষ্টি করে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি জানা একটি মধ্যপন্থা। দৃষ্টান্তস্থলে, কৃষক সময়ের পূর্বে বা পরে তাহার বীজ বপন করিলে, সে উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করে। পুণ্য, সত্য এবং প্রজ্ঞা সব মধ্যপন্থায় রহিয়াছে এবং মধ্যপন্থা রহিয়াছে পরিস্থিতি নির্ধারণে। অথবা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, সত্য সর্বদা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মিথ্যার মধ্যভাগে থাকে। উহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সঠিক সুযোগ অনুসরণেই মানুষ সর্বদা মধ্যপন্থায় থাকে। খোদাকে চিনিবার ব্যাপারে মধ্যপন্থার পরিচয় এই যে, খোদার গুণ বর্ণনায় নেতিবাচক গুণাবলীর দিকে অধিক ঝুঁকিবে না এবং খোদাকে জড় দেহধারী জিনিষের অনুরূপ বলিয়া নির্ধারণ করিবে না। কুরআন শরীফ স্রষ্টার গুণাবলী বর্ণনায় এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। যেমন উহা বলে যে, খোদা দেখেন, শোনেন, জানেন, বলেন, বাক্যালাপ করেন, তেমনি উহা অন্যদিকে সৃষ্টির সাদৃশ্য হইতে রক্ষা করার জন্য বলে ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ (সূরা শো'আরা, 42 : 12)

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ (সূরা নহল, 16 : 75)

অর্থাৎ, "খোদার সত্তায় ও গুণে তাঁহার কোন অংশীদার নাই। তাঁহার সঙ্গে সৃষ্টির উপমা দিবে না" (৪২ঃ১২, ১৬ঃ৭৫)। সুতরাং, খোদার সত্তাকে উপমিত এবং উপমাতীত এই উভয়ের মাঝামাঝি রাখাই মধ্যপন্থা। বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষা সবই মধ্যপন্থার শিক্ষা। সূরা ফাতেহাও মধ্যপথে চলার হেদায়াত দান করে। কারণ, খোদাতা'লা বলেন ঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ (সূরা ফাতিহা, 1 : 7)

কোপগ্রস্তদিগের مَغْضُوْبِ দ্বারা তাহাদিগকে বুঝায় (১ঃ৭), যাহারা খোদাতা'লার মোকাবেলায় ক্রোধ রিপুর বশবর্তী হইয়া পশুবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করিয়া চলে এবং পথভ্রষ্টগণ ضَآلِّيْنَ দ্বারা তাহাদিগকে বুঝায়, যাহারা পশুবৃত্তিনিচয়ের অনুগমন করে। মধ্যপন্থা সেই পথ, যাহা اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (যাঁহারা পুরস্কারপ্রাপ্ত) বাক্যাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আশিসপ্রাপ্ত উম্মতের জন্য কুরআন শরীফে মধ্যপন্থার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তওরাতে খোদাতা'লা প্রতিশোধের উপর জোর দিয়াছিলেন এবং ইঞ্জিলে ক্ষমার উপর জোর দিয়াছিলেন। এই উম্মতকে পরিস্থিতি চেনার এবং মধ্যপন্থার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, খোদাতা'লা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (সূরা বাকারা, 2:144)

অর্থাৎ, "আমরা তোমাদিগকে মধ্যপন্থার উপর আমলকারী করিয়াছি এবং তোমাদিগকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়াছি। অতএব, ধন্য তাহারা, যাহারা মধ্য পথে চলে।" (২ঃ১৪৪)

خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا 'মধ্য পন্থাই সর্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট।'

রূহানী (আধ্যাত্মিক) অবস্থাসমূহ

তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ 'রূহানী অবস্থা' কি? জানা আবশ্যক, ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, কুরআন শরীফের হেদায়াত অনুসারে রূহানী অবস্থার উৎস হইতেছে 'নাফ্সে মুৎমাইন্নাহ্' (প্রশান্ত আত্মা), যাহা মানুষকে উত্তম চরিত্র লাভের মর্যাদা হইতে খোদা লাভের মর্যাদায় পৌঁছায়। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাহ্ শানুহু বলেন ঃ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ (সূরা ফজর, 89 : 28-31)

অর্থাৎ, "হে খোদার সহিত শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা, আপন প্রভু পরওয়ারদিগারের নিকট ফিরিয়া আইস। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি তাঁহাতে সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের হইয়া যাও এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর" (৮৯ঃ২৮-৩১)।

এই স্থলে রূহানী অবস্থা ব্যক্ত করিবার জন্য এই মহা সম্মানিত আয়াতের একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। স্মরণ রাখিতে হইবে, মানুষের উচ্চ পর্যায়ের রূহানী অবস্থা এই পার্থিব জীবনে ইহাই যে, সে খোদাতা'লার নিকট হইতে শান্তি পাইয়া যায় এবং তাহার সম্যক শান্তি, সুখ ও তৃপ্তি খোদার মধ্যেই নিবদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই সেই অবস্থা যাহাকে অন্য কথায় বেহেশ্‌তী জীবন বলা হয়। এই অবস্থায় মানুষ তাহার পূর্ণ আন্তরিকতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততার বিনিময়ে নগদ বেহেশ্‌ত পাইয়া যায়। অন্যেরা প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌তের অপেক্ষা করে, পক্ষান্তরে ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত মানুষের বেহেশ্‌ত বর্তমানেরই অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া মানুষ বুঝিতে পারে যে, যে এবাদতের বোঝা তাহার মাথার উপর চাপান হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে উহাই এমন এক খাদ্য , যদ্বারা তাহার আত্মা পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে এবং যাহার উপর তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ইহার ফলপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোন জগতের অপেক্ষা করিতে হয় না। এখানেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। সেই সব ধিক্কার, যাহা নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্ মানুষকে তাহার অপবিত্র জীবনের জন্য দিয়া থাকে এবং ইহা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে সাধু আগ্রহ ও আকাঙ্খা ভাল মত জাগ্রত করিতে পারে না, কুপ্রবৃত্তির প্রতিও প্রকৃত ঘৃণার সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় না, এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পুরোপুরি শক্তিদানেও সফল হয় না, তাহা সেই পবিত্র প্রেরণায় পরিবর্তিত হইয়া যায়, যাহা 'নাফ্‌সে মুৎমাইন্নাহ্'র উদ্‌গমের সূচনা করে। এই পর্যায়ে পৌঁছালেই সেই সময় আসে, যখন মানুষ পূর্ণ সফলতা লাভ করে। তখন তাহার যাবতীয় নীচ প্রবৃত্তি আপনাআপনি নির্জীব হইতে থাকে, এবং তাহার আত্মায় এমন এক শক্তিসঞ্চারী বায়ু-প্রবাহ চলিতে থাকে, যাহার ফলে সে পূর্বেকার দুর্বলতা অনুতাপের দৃষ্টিতে দেখে। তখন মানুষের স্বভাবে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। অভ্যাসসমূহে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং মানুষ তাহার পূর্ববস্থা হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায়। সে ধৌত এবং পরিস্কৃত

হয়। খোদা স্বহস্তে পুণ্যের আকর্ষণ তাহার হৃদয়ে ঢালিয়া দেন এবং অসাধুতার সব ময়লা স্বহস্তে তাহার হৃদয়ের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেন। সত্যের সেনাবাহিনী সর্বৈব তাহার হৃদয় কন্দরে উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রকৃতির সকল মিনার-চূড়ায় ন্যায়পরায়ণতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সত্যের জয় হয়। মিথ্যা পলায়ন করে ও স্বীয় অস্ত্র ফেলিয়া দেয়। হেন ব্যক্তির হৃদয়ে খোদার হাত স্থাপিত হয়। সে প্রত্যেক পদক্ষেপে খোদার ছায়ায় চলিতে থাকে। যেমন, খোদাতা'লা নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে এই সব কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন ঃ

أُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط (সূরা মুজাদিলা, 58 : 23)

حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (সূরা হুজুরাত, 49 : 8-9)

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 82)

অর্থাৎ, "খোদা মোমেনদের হৃদয়ে স্বহস্তে ঈমান লিখিয়া দিয়াছেন এবং রূহুল কুদ্দুস দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন (৫৮ঃ২৩)। হে মোমেনগণ! তিনিই ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করিয়াছেন। ইহার রূপ ও সৌন্দর্য তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কুফরী, কুকার্য ও পাপের প্রতি তোমাদের চিত্তে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের হৃদয়ে কুপথসমূহের কদর্য ও ঘৃণিত হওয়াকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সব কিছু খোদার ফযল ও রহমতে হইয়াছে (৪৯ঃ৮-৯)। সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য পলায়ন করিয়াছে। মিথ্যা কবে সত্যের সম্মুখে টিকিতে পারিয়াছে?" (১৭ঃ৮২)

বস্তুতঃ, এই সব ইঙ্গিতই সেই আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি, যাহা তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ লাভ করিয়া থাকে। সত্যিকার দৃষ্টিশক্তি মানুষ কখনও লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর খোদাতা'লা যে বলিয়াছেন ঃ "আমি তাহাদের হৃদয়ে স্বহস্তে ঈমান লিখিয়া

দিয়াছি এবং রূহুল কুদ্দুস দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছি" উহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, মানুষ সত্যিকার পবিত্রতা ও শুচিতা কখনও লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না স্বর্গীয় সাহায্য তাহার সঙ্গী হয়। 'নাফ্‌সে লাউওয়ামাহ্' পর্যায়ে মানুষের এই অবস্থা থাকে যে, সে বার বার তওবা করে এবং বার বার পতিত হয়। বরং অনেক সময় সে আত্মশুদ্ধি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে। স্বীয় ব্যাধিকে চিকিৎসার অতীত মনে করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমনই থাকে। অতঃপর, নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে, রাত্রিকালে বা দিবাকালে সহসা এক আলোক তাহার উপর অবতীর্ণ হয়। এই আলোকে ঐশী শক্তি থাকে। এই আলোকের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিবর্তন তাহার মধ্যে সাধিত হয় এবং অদৃশ্য হস্তের এক শক্তিশালী প্রভাব অনুভূত হয়। এক আশ্চর্য জগৎ তাহার সামনে উপস্থিত হয়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, খোদা আছেন এবং তাহার চোখে এক জ্যোতিঃ আসে, যাহা ইতিপূর্বে ছিল না। কিন্তু এই পথকে কীভাবে লাভ করা যাইবে এবং এই আলোকে কী প্রকারে পাওয়া যাইবে? ইহার জন্য জানা উচিত যে, এই হেতুময় জগতে প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনে কারণ আছে এবং প্রত্যেক গতির পিছনে গতিদাতা আছে। প্রত্যেক জ্ঞান অর্জনের এক পন্থা আছে। উহাকে **'সিরাতে মুস্তাকীম'** (সরল-সুদৃঢ় পথ) বলে। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা পাওয়ার জন্য আদি হইতে নির্ধারিত প্রকৃতির নিয়ম কানুনের অনুগমন ছাড়া লাভ করা যায়। প্রাকৃতিক নিয়ম এই শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক বস্তুকে পাওয়ার এক 'সিরাতে মুস্তাকীম' আছে। উহার অর্জন স্বভাবতঃ সেই পথের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি আমরা কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকি এবং সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের জন্য 'সিরাতে মুস্তাকীম' হইতেছে প্রকোষ্ঠের সেই অর্গন খুলিয়া দেওয়া, যাহা সূর্যের দিকে রহিয়াছে। তবেই তৎক্ষণাৎ সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে আলোকিত করিয়া দিবে। সুতরাং, স্পষ্ট কথা এই যে, খোদার সত্য এবং প্রকৃত আশিস্‌সমূহ পাওয়ার জন্যও অনুরূপভাবে কোন খিড়কি থাকিবে এবং পবিত্র রূহানীয়্যত লাভেরও কোন বিশেষ পন্থা থাকিবে এবং উহা ইহাই যে, রূহানী ব্যাপারে আমরা যেন ঠিক তেমনিভাবে 'সিরাতে মুস্তাকীম' অন্বেষণ করি, যেমন আমরা আমাদের পার্থিব সফলতার জন্য 'সিরাতে মুস্তাকীম' অন্বেষণ করিয়া

থাকি। কিন্তু সে কি এই পন্থা যে, আমরা শুধু আমাদের বুদ্ধির বলে এবং নিজেদের মনগড়া উপায়ে খোদার নৈকট্য অন্বেষণ করিব? শুধু কি আমাদের নিজ তৈরি ন্যায়শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা তাঁহার সেই দুয়ার আমাদের নিকট খুলিবে, যাহার উদ্‌ঘাটন তাঁহার শক্তিশালী হস্তের উপর নির্ভরশীল? না, নিশ্চিতরূপে জানিও যে, اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। চিরঞ্জীবী ও জীবনদাতা এবং চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা খোদাকে আমরা শুধু আমাদেরই চেষ্টা তদ্বীর দ্বারা কখনও পাইতে পারি না। বরং ইহার জন্য 'সিরাতে মুস্তাকীম' শুধু ইহাই যে, আমরা আমাদের জীবনকে আমাদের যাবতীয় শক্তিসহ খোদাতা'লার পথে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করিয়া খোদা মিলনের জন্য দোয়ায় মগ্ন হই, যাহাতে খোদাকে খোদার সাহায্যেই পাইতে পারি।

একটি অতি প্রিয় দোয়া

সর্বাপেক্ষা প্রিয় দোয়া, যাহা আমাদিগকে উপযুক্ত পরিবেশ এবং যথার্থ পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে এবং আমাদের প্রকৃতির রূহানী আবেগের নক্‌শা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, উহা সেই দোয়া, যাহা দয়ালু খোদা তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে, 'সূরা ফাতিহায়' আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং উহা এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

"যত পবিত্র গুণগান হইতে পারে, সবই সেই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, যিনি জগত সমূহের সৃষ্টিকর্তা এবং স্থিতিদাতা।"(**1:1-2**)

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

"সেই খোদা যিনি আমাদের কর্মের পূর্বে আমাদের জন্য রহমতের সকল সামগ্রী সরবরাহকারী এবং আমাদের কর্মের পর রহমতের সঙ্গে পুরস্কার দানের ব্যবস্থাকারী" (**1:3**)।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

"সেই খোদা যিনি প্রতিদান দিবসের একমাত্র মালিক এবং সেই দিনকে তিনি অন্য কাহারও নিকট সোপর্দ করেন নাই" (**1:4**)।

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ

"হে এই সকল প্রশংসার আধার! আমরা তোমারই আরাধনা করি এবং আমরা সকল কাজের তৌফীক তোমারই নিকটে চাই" (1:5)।

এখানে "আমরা" শব্দ দ্বারা আরাধনার স্বীকৃতি এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, আমাদের সকল অভ্যন্তরীণ শক্তি তোমারই আরাধনায় নিয়োজিত এবং তোমারই আস্তানায় অবনত। কারণ মানুষ নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের দিক হইতে এক জামাত, এক উম্মত এবং এই হিসাবে সম্মিলিত সকল শক্তির 'উৎস' খোদাকে সিজদা করাই সেই অবস্থা, যাহাকে ইসলাম বলা হয়।

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۬ۙ

"আমাদিগকে তোমার সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও এবং উহার উপরে আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করিয়া ঐ সকল ব্যক্তির পথ দেখাও যাহাদের উপর তোমার পুরস্কার ও সম্মান রহিয়াছে এবং যাহারা তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণের পাত্র হইয়াছে"(1:6)।

غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ۧ

"আমাদিগকে ঐ সকল লোকের যাবতীয় পথ হইতে রক্ষা কর যাহাদের উপর তোমার ক্রোধ নিপতিত হইয়াছে এবং যাহারা তোমার কাছে পৌঁছিতে পারে নাই এবং পথ ভুলিয়া গিয়াছে" আমীন! হে খোদা, তুমি এইরূপই কর" (1:7)।

এই আয়াতগুলিতে বুঝান হইয়াছে যে, খোদাতা'লার পুরস্কার, যাহা অন্য কথায় ফয়ুয (আশিস্‌সমূহ) বলিয়া কথিত, তাহাদেরই উপর অবতীর্ণ হয়, যাহারা তাহাদের জীবন খোদার পথে কুরবানী করে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তাঁহার পথে ওয়াক্‌ফ ও উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টিতে নিমগ্ন হইয়া যায়। এজন্য আবার দোয়াও করিতে থাকে যে, আত্মিক সম্পদ, খোদার নৈকট্য ও মিলন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের মধ্যে যাহা কিছু মানুষ পাইতে পারে, তাহা সবই যেন তাহারা পায়। উপরন্তু এই দোয়ার সঙ্গে তাহাদের সম্যক অভ্যন্তরীণ শক্তি

নিয়োজিত করিয়া তাহারা আরাধনা করিতে থাকে এবং গুনাহ্ হইতে বাঁচে, আল্লাহ্র দুয়ারে পড়িয়া থাকে, আর অন্যায় হইতে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে এবং ঐশী ক্রোধের পথসমূহ হইতে দূরে থাকে। সুতরাং, যেহেতু তাহারা উচ্চ সাহস এবং বিশ্বস্ততার সহিত খোদাকে অন্বেষণ করে, সেই জন্য তাহারা তাঁহাকে পায় এবং খোদাতা'লার পবিত্র বহু তত্ত্ব-জ্ঞানের সুধা পানে পরিতৃপ্ত হয়। এই আয়াতে যে এস্তেকামত (ধৈর্য)-এর কথা বলা হইয়াছে, ইহা এই কথার দিকে ইঙ্গিত দিতেছে যে, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ আশিস, যাহা আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহা পূর্ণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের সহিত সংবদ্ধ। পূর্ণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের দ্বারা এমন সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অবস্থাকে বুঝায়, কোন পরীক্ষা যাহার মধ্যে বিচ্যুতি ঘটাইতে পারে না। অর্থাৎ, সংযোগ যেন এমন প্রকারের দৃঢ় হয়, যাহাকে না তলোয়ার কাটিতে পারে, না কোন আগুন তাহার ক্ষতি সাধন করিতে পারে না অন্য কোন বিপদ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। প্রিয় আত্মীয়গণের মৃত্যু যেন সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারে। প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদও যেন উহার মধ্যে কোন শিথিলতা আনিতে না পারে। অপমানের ভয়ও যেন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। নিদারুণ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিতেও যেন হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভীতির সঞ্চার না হয়। সুতরাং, এই দুয়ার নিতান্ত সংকীর্ণ। এই পথ অতিশয় দুর্গম। ইহা কত ভয়াবহ বিপদ সংকুল। হায়! শত বার হায়!

ইহারই দিকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিতে করিতেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ
وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ
اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ (সূরা তওবা, 9 : 24)

অর্থাৎ, "তাহাদিগকে বলঃ যদি তোমদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের

শ্রমলব্ধ ধন-সম্পত্তি এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহা বন্ধ হওয়াকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের ঘর-বাড়ী, যাহা তোমরা পছন্দ কর, তাহা খোদা হইতে এবং তাঁহার রসূল হইতে এবং খোদার পথে নিজেদের জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করা হইতে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না খোদা তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন। আর খোদা দুরাচার দুষ্কৃতকারীদিগকে কখনও তাঁহার পথ প্রদর্শন করেন না" (৯ঃ২৪)।

এই আয়াতগুলি হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, খোদার সন্তুষ্টিকে জলাঞ্জলি দিয়া যাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও ধন সম্পদকে ভালবাসে তাহারা খোদার দৃষ্টিতে দুষ্কৃতকারী। তাহারা নিশ্চয় ধ্বংস হইবে। কারণ তাহারা অন্যকে খোদার উপর প্রাধান্য দিয়াছে।

ইহা সেই তৃতীয় পর্যায়, যাহাতে ঐ ব্যক্তি খোদাপ্রাপ্ত হয়, এমনভাবে সংবদ্ধ হয় যে, সহস্র সহস্র বিপদ বরণ করিয়া খোদার দিকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হয়। তখন খোদা ব্যতীত তাহার কেহ থাকে না; যেন সকলেই মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সত্য কথা ইহাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না মরি, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত খোদার দর্শন সম্ভব নহে। খোদার প্রকাশের দিন উহাই, যখন আমাদের পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আসে। আমরা অন্ধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অপর সকল বস্তুর উপর হইতে আমাদের দৃষ্টি উঠাইয়া লই। আমরা মৃত, যে পর্যন্ত না আমরা খোদার হাতে মৃতবৎ হই। যখন আমাদের মুখ সঠিকভাবে তাহার সম্মুখে সংস্থাপিত হইবে, তখনই প্রকৃত এস্তেকামত বা দৃঢ়তা যাহা সমগ্র বাসনা-কামনার উপর বিজয়ী হয়, আমাদের লাভ হইবে; তৎপূর্বে নহে এবং ইহাই সেই এস্তেকামত, যদ্বারা হীন পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আসে। আমাদের এস্তেকামত হইতেছে উহাই যেমন, তিনি বলিয়াছেন ঃ

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (সূরা বাকারা, 2 : 113)

অর্থাৎ, কুরবানীর পশুর ন্যায় আমার সম্মুখে গর্দান রাখ (২ঃ১১৩)। এই উপায়ে আমরা তখনই এস্তেকামতের পর্যায়ে পৌঁছিব, যখন আমাদের অস্তিত্বের সাকল্য অংশ এবং আমাদের আত্মার যাবতীয় শক্তি তাঁহারই কাজে নিয়োজিত হইবে। এবং আমাদের মৃত্যু, আমাদের জীবন তাঁহারই জন্য হইয়া যাইবে। যেমন, তিনি বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○ (সূরা আন্‌আ'ম, 6 : 163)

অর্থাৎ, "বল ঃ আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা এবং আমার মরিয়া যাওয়া সবই খোদার জন্য" (৬ঃ১৬৩)। যখন খোদার সহিত মানুষের প্রেম এই সীমানায় পৌঁছিয়া যায়, তখন তাহার জীবন ও মরণ নিজের জন্য না হইয়া বরং খোদার জন্য হইয়া যায়। তখন সেই খোদা, যিনি সর্বদা প্রেমিকদের সহিত প্রেম করেন, তাঁহার প্রেম তাহার উপর অবতীর্ণ করেন। এই দুই প্রেমের সম্মিলনে মানুষের মধ্যে এক আলোক সৃষ্টি হয়, যাহা দুনিয়া চিনিতে পারে না এবং বুঝিতে পারে না। সহস্র সহস্র পরম সত্যনিষ্ঠ, সিদ্দীক ও খোদার মনোনীত ব্যক্তি এই কারণেই নিহত হইয়াছেন যে, জগদ্বাসী তাঁহাদিগকে চিনে নাই। এই কারণেই তাঁহারা প্রতারক ও স্বার্থপর বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছেন। কারণ পৃথিবীবাসী তাঁহাদের আলোকময় মুখশ্রী দর্শন করিতে পারে নাই। যেমন খোদাতা'লা বলেন ঃ

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○ (সূরা আ'রাফ, 7 : 199)

অর্থাৎ, "অস্বীকারকারীরা তোমার দিকে তাকায় বটে, কিন্তু তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না" (৭ঃ১৯৯)।

বস্তুতঃ, যখন সেই আলোকের সৃষ্টির দিন হইতে এক মর্তবাসী ব্যক্তি স্বর্গবাসী মানুষে পরিণত হইয়া যায় তখন যিনি সর্বসত্তার মালিক, তিনি তাহার অন্তরে কথা বলেন এবং আপন স্বর্গীয় দীপ্তি প্রকাশ করেন। পবিত্র প্রেমভরা সেই হৃদয়কে স্বীয় সিংহাসন বানাইয়া লন। যখন হইতে এই ব্যক্তি আলোকময় পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়া এক নূতন খোদা হইয়া যান এবং নূতন রীতিনীতি ও নূতন ব্যবহার প্রকাশ করেন। এমন নহে যে, তিনি সত্যই নূতন খোদা হইয়া যান বা তাঁহার আচরণ নূতন হয়, বরং উহা খোদার সাধারণ আচরণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, যাহার সহিত পৃথিবীর দর্শন শাস্ত্র পরিচিত নহে। এহেন ব্যক্তির সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِیْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

(সূরা বাকারা, 2 : 208)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তাহারা উচ্চ পর্যায়ের মানুষ, যাহারা খোদার সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়। তাহারা নিজেদের প্রাণ বিক্রয় করিয়া খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের উপর খোদার সন্তুষ্টি রহমত (২ঃ২০৮)। এইভাবে যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থার মর্যাদায় পৌঁছিয়া যায় সে খোদার পথে বিলীন হইয়া যায়।

খোদাতা'লা এই আয়াতে বলেন যে, সেই ব্যক্তিই যাবতীয় দুঃখ হইতে মুক্তি পায়, যে আমার পথে, আমার সন্তুষ্টির পথে প্রাণ বিক্রয় করে এবং প্রাণপণে এই অবস্থারই প্রমাণ দেয় যে, সে খোদার। এবং সে তাহার সমগ্র অস্তিত্বকে এমন জিনিষ বলিয়া জানে, যাহা স্রষ্টার আনুগত্য ও সৃষ্টির সেবার জন্যই তৈয়ার করা হইয়াছে। তারপর, প্রত্যেক প্রকার শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যিকার সৎকর্মসমূহ এরূপ উৎসাহ, আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে সম্পাদন করে যে, সে যেন আপন আনুগত্যের দর্পনে তাহার প্রকৃত প্রেমাস্পদকে দর্শন করিতে থাকে। তাহার ইচ্ছা খোদাতা'লার ইচ্ছার রঙে রঙীন হইয়া যায়। তৃপ্তি তাঁহার আদেশ পালনেই স্থিতিশীল হইয়া যায়। তাহার সকল সৎকর্ম কষ্টসাধ্য পথে না হইয়া, মনের সাধ ও বিমল আনন্দের আকর্ষণে সাধিত হয়। ইহাই সেই নগদ বেহেশ্‌ত, যাহা রূহানী মানুষ প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে সে যে বেহেশ্‌ত পাইবে, প্রকৃতপক্ষে উহা ইহারই প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হইবে। উহাকে পরলোকে খোদাতা'লার কুদরত সাকারে দৃশ্যমান করিয়া দিবেন। ইহারই প্রতি সংকেত করিয়া আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ (সূরা আর-রহ্‌আন, 55 :47)

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ○ (সূরা দহর, 76 : 22)

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا
عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○ (সূরা দহর, 76 : 6-7)

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۚ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ○
(সূরা দহর, 76 : 18-19)

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○ (সূরা দহর, 76 : 5)

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল, **17 : 73**)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি খোদাতা'লাকে ভয় করে এবং তাঁহার মহাপ্রতাপান্বিত গৌরবময় মর্যাদার ভয়ে সন্ত্রস্ত, তাহার জন্য দুইটি বেহেশ্‌ত আছে" এক, এই দুনিয়ায় এবং দ্বিতীয়, আখেরাতে (৫৫ঃ৪৭)। যাহারা খোদায় নিমগ্ন হইয়াছে খোদা তাহাদিগকে সেই শরবত পান করাইয়াছেন, যাহা তাহাদের হৃদয়, চিন্তাধারা এবং সংকল্পসমূহকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে (৭৬ঃ২২)। সাধু ব্যক্তিগণ ঐ শরবত পান করিতেছে; উহা কর্পূর মিশ্রিত। তাহারা যে প্রস্রবণ হইতে পান করে, উহা তাহারা নিজেরাই খনন করে" (৭৬ঃ ৬-৭)।

কর্পূর ও আদা মিশ্রিত শরবতের তত্ত্বকথা

ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি যে, অত্র আয়াতে كَافُور কর্পূর শব্দ এই জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যে, আরবী ভাষায় كَفَرَ (কাফারা) শব্দ দমন করা এবং ঢাকিয়া দেওয়াকে বুঝায়। সুতরাং, ইহা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাহারা এমন আন্তরিকতাসহ সংসারের মায়া কাটাইয়া আল্লাহ্‌তা'লার দিকে রুজু হইয়াছে যে, তাহাদের দুনিয়ার প্রতি আসক্তি একেবার ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম যে, সব আবেগ ও উত্তেজনা অন্তরের খেয়াল হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন মন এইসব অযোগ্য চিন্তাধারা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ে এবং উহাদের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, তখন ঐ সব উত্তেজনাও ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে এবং অবশেষে, সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং এখানে খোদাতা'লার উদ্দেশ্য ইহাই। তিনি এই আয়াতে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার দিকে যাহারা সম্পূর্ণ প্রণত হইয়াছে, তাহারা নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে অনেক দূরে প্রস্থান করিয়াছে এবং খোদার দিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়াছে, যেন পার্থিব বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাহাদের চিত্ত হইতে অনেক দূরে প্রস্থান করিয়াছে এবং তাহাদের প্রবৃত্তির আসক্তিসমূহ এমনভাবে দমিত হইয়াছে, যেমন কর্পূর বিষাক্ত পদার্থসমূহের বিষকে দমন করে।

তারপর বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তিগণ এই কর্পূর মিশ্রিত পাত্র হইতে পান করার পর তাহারা زَنجَبِيل (আদা) মিশ্রিত পাত্র হইতে পান করে (৭৬ঃ১৮-১৯)। এখন জানা আবশ্যক, আরবী শব্দ 'যাঞ্জাবিল', দুইটি শব্দ যোগে গঠিত। অর্থাৎ, 'যানা' زَنا ও 'জবল' جبل শব্দদ্বয় দ্বারা গঠিত। আরবী ভাষায় 'যানা' শব্দ দ্বারা উপরে উঠা বোঝায় এবং 'জবল' পর্বতকে বলে। সম্মিলিত অর্থ পর্বতের উপরে উঠা। এখন জানা কর্তব্য, কোন বিষাক্ত ব্যাধির নিরাময়ের পর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ পর্যন্ত মানুষকে দুইটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। একটি অবস্থা, যখন প্রদাহের প্রচন্ডতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় এবং রোগের মারাত্মক উগ্রতা নিবারিত হইয়া রোগী আরোগ্যমুখী হয় এবং সাংঘাতিক উপসর্গ সম্বলিত আক্রমণ কল্যাণ ও নিরাপত্তার সহিত কাটিয়া যায় এবং যে মারাত্মক ঝটিকা উঠিয়াছিল, উহা প্রশমিত হইয়া যায়, কিন্তু এখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দুর্বলতা বর্তমান থাকে, রুগী জোরের কোন কাজ করিতে পারে না এবং চলিতে গেলে দুর্বলতায় মৃতের ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়া যাইতে চাহে। দ্বিতীয় অবস্থা, যখন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। দেহে সম্পূর্ণ বল সঞ্চার হয় এবং শক্তি ফিরিয়া পাওয়ায় বিনা কষ্টে পর্বত আরোহণের সাহস জন্মে। প্রফুল্লচিত্তে উচ্চ শৃঙ্গের উপর দিয়া দৌড়াইতে থাকে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের তৃতীয় পর্যায়ে এই অবস্থা লাভ হয়। এইরূপ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা উপরোল্লিখিত আয়াতে ইঙ্গিত করে যে, শেষ পর্যায়ে খোদা-প্রাপ্ত মানুষ যাঞ্জাবিল বা আদা মিশ্রিত পাত্র হইতে পান করে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ শক্তি লাভ করিয়া বড় বড় শৃঙ্গারোহণ করে। অনেক দুঃসাধ্য কার্য তাহাদের হস্তে সুসম্পন্ন হয়। খোদার পথে তাহারা আত্মদানের অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন প্রদর্শন করে।

যাঞ্জাবিলের ক্রিয়া

এস্থলে বলা প্রয়োজন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক হইতে যাঞ্জাবিল একটি ঔষধ। হিন্দীতে ইহাকে শুঁঠ বলে। ইহা অত্যন্ত জৈব-তাপ বর্ধক এবং ভেদ রোধক। ইহার নাম যাঞ্জাবিল রাখার ইহাই কারণ। অন্য কথায়, ইহা দুর্বলকে এমন শক্তিশালী করে এবং এরূপ সতেজ করিয়া তোলে

যে, সে পর্বত আরোহণে সক্ষম হয়। আলোচ্য আয়াতগুলি পেশের মাধ্যমে, যাহার একটিতে কর্পূর এবং অন্যটিতে শুঁঠ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, খোদাতা'লা বান্দাগণকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মানুষ নীচ প্রবৃত্তি হইতে পুণ্যের দিকে পদক্ষেপ করিলে, প্রথমে এই ক্রিয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, উহাতে বিষাক্ত পদার্থের দমন হয় এবং নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হ্রাস পাইতে থাকে, যেমন কর্পূর বিষাক্ত দোষ দমন করে। এই কারণেই ইহা বিসূচিকা ও মেয়াদী জ্বরে উপকার করে। তারপর যখন বিষাক্ত পদার্থের তীব্রতা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পাইতে থাকে এবং দুর্বলতা সম্পৃক্ত এক প্রকার কমজোর স্বাস্থ্য লাভ হয়, তখন দ্বিতীয় অবস্থায় সেই দুর্বল রোগী শুঁঠ মিশ্রিত সুধা পানে শক্তিশালী হইয়া উঠে। যাঞ্জাবিলের শরবত হইতেছে খোদাতা'লার সৌন্দর্যের জ্যোতিবির্কাশ, যাহা আত্মার খোরাক। এই জ্যোতির্বিকাশ দ্বারা মানুষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, উচ্চ শিখরে আরোহণের যোগ্যতা লাভ করে। তখন খোদাতা'লার পথে এমন আশ্চর্য দুরূহ কাজ সম্পাদন করে, তপ্ত প্রেমানুরাগ হৃদয়ে না থাকিলে যাহা কখনও কাহারও পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। সুতরাং, খোদাতা'লা এই দুইটি অবস্থা বুঝাইবার জন্য আরবী ভাষার দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একটি হইল কর্পূর, যদ্বারা নিম্নে দাবাইয়া রাখা বুঝায় এবং অন্যটি হইল যাঞ্জাবিল, যদ্বারা উর্দ্ধে আরোহণকারীকে বুঝায়। এই পথে এই দুইটি অবস্থায় 'সালেক' বা আধ্যাত্মিক পথচারীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

আয়াতের অবশিষ্টাংশ এই ঃ

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۠ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ○ (সূরা দহর, 76 : 5)

অর্থাৎ, "আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য, যাহারা সত্য গ্রহণে অনিচ্ছুক, শিকল তৈরী করিয়াছি এবং গলার হাড়কাঠ ও এক জ্বলন্ত অগ্নির দহন" (৭৬ঃ৫)। এই আয়াতের অর্থ ঃ যাহারা সত্যিকার আন্তরিকতাসহ খোদাতা'লাকে অন্বেষণ করে না, তাহাদের প্রতি খোদার দিক হইতে অভিসম্পাত হইতে থাকে। তাহারা সংসারের বাঁধনে এমনইভাবে জড়িত হইয়া যায়, যেন তাহাদের পা শিকলাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা পার্থিব কাজে এতই অধঃমুখী হয়, যেন তাহাদের গলায় হাড়কাঠ পড়িয়া গিয়াছে,

যাহা তাহাদিগকে আকাশের দিকে মাথা তুলিতে দেয় না। তাহাদের হৃদয়ে লোভ লিপ্সার আগুন জ্বলিতে থাকে, যেন তাহাদের ইপ্সিত অর্থ, ইপ্সিত সম্পত্তি ও ইপ্সিত দেশ হস্তগত হইয়া যায়, তাহাদের শত্রুর উপর যেন তাহারা জয়লাভ করিতে পারে এবং তাহারা যেন প্রভূত অর্থ ও সম্পদের অধিকারী হয়। সুতরাং যেহেতু খোদাতা'লা দেখিতে পান যে, তাহারা অযোগ্য এবং কুক্রিয়াসক্ত, সেই জন্য তিনি এই তিন বিপদেই তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া দেন। এখানে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যখন মানুষের দিক হইতে কোন কার্য প্রকাশিত হয়, তখন খোদাও তাঁহার দিক হইতে অনুরূপ এক ক্রিয়া প্রকাশ করেন। যেমন মানুষ যখন তাহার প্রকোষ্ঠের সব দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন মানুষের এই কার্যের পর খোদাতা'লার দিক হইতে এই ক্রিয়া হইবে যে, তিনি সেই প্রকোষ্ঠে অন্ধকার সৃষ্টি করিবেন। কারণ, খোদাতা'লার প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের কার্যের অনিবার্য ফলস্বরূপ যাহা যাহা নির্ধারিত হইয়াছে, ঐ সবই খোদাতা'লার ক্রিয়া। কেননা, তিনিই সব কারণের আদি কারণ। অনুরূপভাবে যদি কেহ বিষ পান করে, তবে তাহার এই কার্যের পর খোদাতা'লার যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহা হইল, তাহার মৃত্যু ঘটিবে। তেমনই যদি কেহ এমন অনুচিত কর্ম করে, যাহা কোন সংক্রামক ব্যাধির কারণ হয়, তবে তাহার এই কর্মের পর খোদাতা'লার যে ক্রিয়া প্রকশিত হইবে উহা এই যে, সেই সংক্রামক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং আমাদের পার্থিব জীবনে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় যে, আমাদের প্রত্যেক কার্যের এক অনিবার্য ফল আছে এবং সেই ফল খোদাতা'লার ক্রিয়া, তেমনই ধর্ম সম্পর্কেও ইহাই বিধান। খোদাতা'লা নিম্ন বর্ণিত দুইটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ (সূরা আনকবুত, 29 : 70)

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ (সূরা আস্-সফ, 61 : 6)

অর্থাৎ, "যাহারা এই কর্ম করে যে, তাহারা খোদাতা'লার অন্বেষণে পুরাপুরি চেষ্টা করে, এই কর্মের জন্য আমাদের এই ক্রিয়া অনিবার্য যে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথ প্রদর্শন করিব (২৯ঃ৭০) এবং যাহারা কুটিলতা অবলম্বন করে এবং সোজা পথে চলিতে চাহে না, তদবস্থায়

আমাদের ক্রিয়া তাহাদের বেলা এই হইবে যে, আমরা তাহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিব (৬১ঃ৬) ।" তারপর, এই অবস্থাকেই আরও অধিক স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 73)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহ জগতে অন্ধ রহিয়াছে, সে পরলোকেও অন্ধই রহিবে; বরং অন্ধ হইতেও মন্দ হইবে" (১৭ঃ৭৩)। ইহা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, পুণ্যবান বান্দাগণ খোদার দীদার (দর্শন) ইহলোকেই পাইয়া থাকেন। তাঁহারা এই জগতেই সেই প্রিয়ের দর্শন লাভ করেন, যাঁহার জন্য তাঁহারা সর্বস্ব বিসর্জন দেন। বস্তুতঃ, এই আয়াতের ভাবার্থ ইহাই যে, বেহেশ্‌তী জীবনের ভিত্তি এই জগতেই স্থাপিত হয় এবং জাহান্নামের অন্ধত্বের মূলও এই জগতেরই পচা ও অন্ধ জীবন।" তারপর বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ

(সূরা বাকারা, 2 : 26)

অর্থাৎ, "যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহারা ঐ সব বাগানের উত্তরাধিকারী, যেগুলির তলদেশ দিয়া নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত" (২ঃ২৬)। এই আয়াতে খোদাতা'লা ঈমানকে বাগানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যাহার তলদেশ দিয়া নদ-নদীসমূহ বহিয়া যায়।

সুতরাং, ইহা স্পষ্ট যে, এখানে এক উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক তত্ত্বের রঙে বলা হইয়াছে যে, বাগানের সঙ্গে নদ-নদীর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কই সৎকর্মের সহিত ঈমানের। কোন বাগান যেমন পানি ছাড়া সবুজ থাকিতে পারে না, তেমনই কোন ঈমান সৎকর্ম ছাড়া জীবিত ঈমান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যদি ঈমান থাকে এবং সৎকর্ম না থাকে, তবে সেই ঈমান তুচ্ছ। যদি সৎকর্ম থাকে এবং ঈমান না থাকে, তবে উহা কেবল লোক দেখানো কর্ম। ইসলামী বেহেশ্‌তের ইহাই হকিকত বা মূল তত্ত্ব। উহা ইহজগতের ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিচ্ছায়া। উহা কোন নতুন জিনিষ হইবে না, যাহা বাহির হইতে আসিয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হইবে। বরং মানুষের বেহেশ্‌ত মানুষের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যেকের বেহেশ্‌ত তাহার ঈমান এবং আমলে সালেহ (সময়োপযোগী

সৎকর্ম)। এই জগতেই এগুলির উপভোগ শুরু হইয়া যায় এবং গুপ্তভাবে ঈমান ও সৎকর্মের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। এবং নহরসমূহও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পরজগতে এই সব বাগান সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। খোদার পবিত্র শিক্ষা আমাদিগকে ইহাই জানায় যে, সত্য-পবিত্র সুদৃঢ় এবং পরিণত ঈমান, যাহা খোদা এবং তাঁহার গুণাবলী ও তাঁহার ইচ্ছার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা সুরম্য ফলদার বৃক্ষরাজিপূর্ণ বেহেশ্‌ত, এবং আমলে সালেহ্ সেই বেহেশ্‌তের নদ-নদী। যেমন, তিনি বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ

(সূরা ইব্রাহীম, 14 : 25-26)

অর্থাৎ, "উহাই ঈমানের বাক্য, যাহা সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও কমবেশী এবং বিভ্রম বিচ্যুতি এবং মিথ্যা ও হাসি-ঠাট্টা হইতে পবিত্র এবং সবদিক দিয়া যাহা পূর্ণ। উহা ঐ বৃক্ষের সহিত তুল্য, যাহা সব কলঙ্ক কালিমা হইতে পবিত্র, যাহার শিকড় ভূমির অভ্যন্তরে সংস্থাপিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তারিত। উহা সর্বদাই ফল দেয় এবং উহার উপর এমন কোন সময় আসে না, যখন উহার শাখায় ফল না থাকে" (১৪ঃ২৫-২৬)। এই বিবৃতিতে খোদাতা'লা ঈমানের বাক্যকে সদা ফলপ্রসূ বৃক্ষের সহিত তুলনা দ্বারা উহার তিনটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

১। **প্রথম লক্ষণ,** উহার শিকড় দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, উহার প্রকৃত মর্ম মানুষের হৃদয়-ভূমিতে বদ্ধমূল হউক। অর্থাৎ, মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষের বিবেক যেন উহার সত্যতা ও মৌলিকত্ব গ্রহণ করিয়া লয়।

২। **দ্বিতীয় লক্ষণ** এই যে, এই বাক্যের শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হউক। অর্থাৎ, যৌক্তিকতা যেন উহার সঙ্গে থাকে এবং আকাশের প্রাকৃতিক বিধান, যাহা খোদার কার্য, যেন এই ক্রিয়াকে অনুমোদন করে। অর্থাৎ, ইহার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার যুক্তি যেন প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রমাণিত হয়। তদুপরি, ঐ সকল যুক্তি যেন এমন উচ্চাঙ্গের হয় যে, উহাদের অবস্থান মনে হয় যেন আকাশে, যেখানে আপত্তির হাত পৌঁছাইতে পারে না।

৩। **তৃতীয় লক্ষণ,** উহার ভোজ্য ফল চিরস্থায়ী হইবে, কখনও শেষ হইবে না। অর্থাৎ, ধারাবাহিক সাধনার ফলে উহার আশিস ও প্রভাব সর্বদা সব যুগে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইতে থাকিবে। এমন নহে যে, কোন যুগ বিশেষে প্রকাশিত হইয়া পরে বন্ধ হইয়া যাইবে। আরও বলেনঃ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

(সূরা ইব্রাহীম, 14 : 27)

অর্থাৎ, "অপবিত্র বাক্য ঐ বৃক্ষের অনুরূপ, যাহা ভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়াছে। অর্থাৎ, মানব প্রকৃতি উহা গ্রহণ করে না এবং কোন প্রকারেই উহা স্থায়ী হয় না। যুক্তি-প্রমাণের দিক হইতেও নহে, প্রাকৃতিক বিধানের দিক হইতেও নহে এবং বিবেকের দিক হইতেও নহে" (১৪ঃ২৭)। উহা শুধু কেস্‌সা কাহিনীর আকারে রহিয়া যায়। তারপর পরলোকে ঈমানের পবিত্র বৃক্ষসমূহকে কুরআন শরীফ আঙ্গুর, আনার এবং ভাল ফলের সহিত তুলনা দিয়া বলিয়াছে যে, তখন উহা ঐ সকল ফলের আকারে দৃশ্যমান হইবে। তেমনই, বেঈমানীর মন্দ বৃক্ষের নাম পরলোকে 'যাক্কুম' রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○

(সূরা আস্ সাফ্‌ফাত, 37 : 63-66)

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ○ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ○ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ○ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ○

(সূরা দুখান, 44 : 44-47)

..... ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ○

(সূরা দুখান, 44 : 50)

অর্থাৎ, "তোমরা বল ঃ বেহেশ্‌তের উদ্যান ভাল, না যাক্কুম বৃক্ষ, যাহা যালেমদের জন্য বিপদস্বরূপ? উহা এক বৃক্ষ, যাহা জাহান্নামের মূল হইতে উৎপন্ন হয়" (৩৭ঃ ৬৩-৬৬)। অর্থাৎ, অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা হইতে সৃষ্টি হয়। ইহার কলি ও ফুল যেন শয়তানের মাথা। শয়তানের অর্থ, যাহার ধ্বংস অনিবার্য। ইহা 'শায়ৎ' ধাতু হইতে উদ্ভূত। সুতরাং, সার

কথা এই যে, ইহা খাওয়ার অর্থ ধ্বংস হওয়া। তারপর বলিয়াছেন, যাক্কুম বৃক্ষ দোযখবাসীদের খাদ্য, যাহারা জানিয়া শুনিয়া পাপ করে। সেই খাদ্য গলিত তাম্রের, যাহা ফুটন্ত পানির ন্যায় পেটের ভিতরে টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে"। তারপর, দোযখবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ "এই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত , মহান ব্যক্তি" (৪৪ ঃ ৪৪-৪৭)! বাক্যটি অত্যন্ত ক্রোধব্যঞ্জক। ইহার তাৎপর্য, তুমি অহঙ্কার না করিলে এবং তোমার বড় হওয়ার এবং সম্মানিত হওয়ার সুযোগ নিয়া সত্য হইতে মুখ না ফিরাইলে, আজ তোমাকে এই সব তিক্ততা ভোগ করিতে হইত না। এই আয়াত এ কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে 'যাক্কুম' زَقُّم শব্দ زُقُّ 'যুক্' এবং اَمْ 'আম্' শব্দ সংযোগে গঠিত। 'আম্' শব্দ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল করীম, (সূরা দুখান, 44 : 50)- আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার। ইহাতে একটি অক্ষর প্রথম এবং আর একটি অক্ষর শেষ হইতে লওয়া হইয়াছে। বহু ব্যবহারের ফলে ذَال (যাল) زَا (যা)-তে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এখন সার কথা, আল্লাহ্তা'লা এই জগতের ঈমানের বাক্যকে যেমন বেহেশ্তের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তেমনই এই জগতেরই বেঈমানী ও অবিশ্বাস সংক্রান্ত বাক্যসমূহকে যাক্কুমের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং উহাকে দোযখের গাছ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, ইহলোক হইতেই বেহেশ্ত ও দোযখের সূত্রপাত হয় যেমন, দোযখ সম্বন্ধে অন্যত্র বলেন ঃ

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ (সূরা হুমাযাহ্, 104 : 7-8)

অর্থাৎ, "দোযখ খোদার ক্রোধাগ্নি হইতে উৎপন্ন হয় এবং গুনাহ্ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। ইহা প্রথমে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে" (১০৪ঃ ৭-৮)। ইহাতে ইঙ্গিত, এই অগ্নির মূল ঐ সব চিন্তা, শোক, দাহ ও দুঃখ, যাহা হৃদয়কে ধৃত করে। কারণ, যাবতীয় আত্মিক শাস্তি, রূহানী আযাব প্রথমে হৃদয় হইতেই শুরু হয়, পরে সমগ্র দেহে ছাইয়া যায়। আরও এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ (সূরা বাকারা, 2 : 25)

অর্থাৎ, "নরকাগ্নির ইন্ধন, যদ্বারা সেই অগ্নি সর্বদা জ্বলিতে থাকে, তাহা হইতেছে দুইটি পদার্থ। এক, ঐ সব মানুষ, যাহারা প্রকৃত খোদাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বস্তুর অর্চনা করে, কিংবা যাহাদের ইচ্ছামূলে ঐ সবের পূজা করা হয়" (২ঃ২৫)। যেমন বলিয়াছেন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط (সূরা আম্বিয়া, 21 : 99)

অর্থাৎ, "তোমরা এবং মানুষ হইয়াও খোদা বলিয়া অভিহিত তোমাদের মিথ্যা মাবূদগণ নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে" (২১ঃ৯৯)। নরকের দ্বিতীয় ইন্ধন প্রতিমা। ইহার তাৎপর্য এই যে, এইগুলির অস্তিত্ব না থাকিলে নরকও থাকিত না। সুতরাং এই আয়াত হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, খোদাতা'লার পবিত্র কালামে বেহেশ্‌ত ও দোযখ এই ভৌতিক জগতের ন্যায় নহে। বরং উভয়েরই উৎপত্তিস্থল রূহানী বিষয়সমূহ। অবশ্য, ঐ সমুদয় জিনিষ পরলোকেও ভৌতিক আকৃতিতে দেখা যাইবে, কিন্তু উহা এই ভৌতিক জগত হইতে হইবে না।

আল্লাহ্‌তা'লার সহিত নিবিড় রূহানী সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়

এখন আমরা আবার মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। খোদার সহিত আত্মিক ও নিবিড় সম্পর্ক জন্মাইবার যে উপায় কুরআন শরীফ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, তাহা ইসলাম ও সূরা ফাতেহার দোয়া। অর্থাৎ, প্রথমে স্বীয় জীবন সাকল্যভাবে খোদার পথে উৎসর্গ করা। তারপর সেই প্রার্থনায় নিমগ্ন হইয়া যাওয়া, যাহা সূরা ফাতিহায় মুসলমানগণকে শিখান হইয়াছে। সমগ্র ইসলামের সারসত্তা দুইটি জিনিস ঃ ইসলাম ও সূরা ফাতিহা। পৃথিবীতে খোদা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং প্রকৃত মুক্তির পানি পান করার ইহাই একমাত্র উত্তম উপায়। বরং ইহাই একমাত্র উপায়; যাহা মানুষের সর্বোচ্চ উন্নতি ও ওসলে ইলাহী বা ঐশী-মিলনের জন্য প্রাকৃতিক বিধান নির্ধারিত করিয়াছে। তাহারাই খোদাকে পায়, যাহারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের আধ্যাত্মিক অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং সূরা ফাতিহায় নিমগ্ন থাকে। **ইসলাম কী জিনিস?** সেই জ্বলন্ত অগ্নি, যাহা

আমাদের হীন ও তুচ্ছ জীবনকে ভস্মীভূত করিয়া এবং আমাদের মিথ্যা উপাস্য বস্তুগুলিকে দগ্ধ করিয়া সত্য ও পবিত্র আরাধ্য মাবুদের সম্মুখে আমাদের প্রাণ, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের সম্ভ্রমের কুরবানী উপস্থিত করে। এহেন উৎসে প্রবেশের ফলে আমরা এক নূতন জীবনের পানি পান করি এবং আমাদের সমগ্র রূহানী শক্তি খোদার সহিত এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হইয়া যায়, যেমন এক আত্মীয় অন্য এক আত্মীয়ের সহিত গভীর যোগ-সূত্রে আবদ্ধ হয়। বিদ্যুতের আগুনের ন্যায় এক অগ্নি আমাদের অভ্যন্তর হইতে বাহির হয়, আর এক অগ্নি উর্দ্ধ হইতে আমাদের উপর নিপতিত হয়। এই দুই অগ্নি শিখার সম্মিলনে আমাদের যাবতীয় আগ্রহ, আকাঙ্খা এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাবতীয় পরকীয়-প্রেম ভস্মীভূত হয়। আমাদের প্রথম জীবনের মৃত্যু হয়। এই অবস্থার নাম কুরআন শরীফ অনুসারে ইসলাম। ইসলামের ফলে আমাদের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার মৃত্যু হয়। তারপর, দোয়া দ্বারা আমরা নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হই। এই দ্বিতীয় জীবনের জন্য এল্হামে-এলাহী বা ঐশীবাণী প্রাপ্তি জরুরী। এই পর্যায়ে পৌঁছার নাম **লেকা-ই-এলাহী** বা খোদা-মিলন, অর্থাৎ খোদার দীদার বা খোদা-দর্শন। এই পর্যায়ে পৌঁছাইলে খোদার সহিত মানুষের এমন নৈকট্য লাভ হয়, যেন সে তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতে থাকে। তখন তাহাকে শক্তি দেওয়া হয়। তাহার যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও অভ্যন্তরীণ শক্তিকে সুসজ্জিত করা হয় এবং পবিত্র জীবনের আকর্ষণ অত্যন্ত জোরে শোরে আরম্ভ হইয়া যায়। এই পর্যায়ে পৌঁছাইলে খোদা মানুষের চক্ষু হইয়া যান, যদ্বারা সে দেখে, জিহ্বা হইয়া যান, যদ্বারা সে কথা বলে, হস্ত হইয়া যান, যদ্বারা সে আক্রমণ করে, কর্ণ হইয়া যান, যদ্বারা সে শ্রবণ করে এবং পা হইয়া যান, যদ্বারা সে চলে। আধ্যাত্মিকতার এই পর্যায় সম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়া খোদা বলিয়াছেন ঃ

يَدُاللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ (সূরা ফাতাহ্, 48 : 11)

"তাঁহার হাত খোদার হাত, যাহা তাহাদের হাতের উপর রহিয়াছে" (৪৮ঃ১১)। আরও বলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ (সূরা আনফাল, 8 : 18)

অর্থাৎ, "তুমি যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা তুমি নহ, বরং খোদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন" (৮ঃ১৮)। বস্তুতঃ এই পর্যায়ে খোদার সহিত পূর্ণ মাত্রায় মিলন সাধিত হয়। খোদাতা'লার পবিত্র ইচ্ছা আত্মার শিরা উপশিরায় সঞ্চারিত হয় এবং পূর্বের দুর্বল নৈতিক শক্তিসমূহ এই পর্যায়ে সুদৃঢ় পর্বতমালার ন্যায় দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অত্যন্ত তীক্ষ্ম হইয়া পড়ে। আল্লাহ্তা'লার এই বাক্যের অর্থ ইহাই ঃ

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط (সূরা মুজাদেলা, 58 : 23)

"এবং তিনি তাহাদিগকে স্বীয় রূহ (বাণী) দ্বারা সাহায্য করিলেন" (৫৮ঃ২৩)। এই পর্যায়ে প্রেম ও ভালবাসার স্রোত এমন মহাবেগে প্রবাহিত হয় যে, খোদার জন্য মৃত্যু, সহস্র সহস্র দুঃখ-কষ্ট এবং অপমান বরণ করা ক্ষুদ্র তৃণখন্ডকে ছিন্ন করার ন্যায় সহজ হইয়া যায়। মানুষ খোদার দিকে আকর্ষিত হইয়া চলে এবং জানে না যে, কে আকর্ষণ করিতেছে? অদৃশ্য হস্ত তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলে। খোদার ইচ্ছা পালন তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে। এই পর্যায়ে খোদা অত্যন্ত নিকটে দেখা দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○ (সূরা কাফ, 50 : 17)

"আমি তাহার জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটবর্তী" (৫০ঃ১৭)। এই অবস্থায়, এই পর্যায়ের মানুষ, পাকা ফলের ন্যায় হইয়া থাকে, যাহা আপনা আপনি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায়। এই প্রকারে এই পর্যায়ের মানুষের যাবতীয় হীন ও তুচ্ছ সম্পর্ক তিরোহিত হইয়া যায়। আপন খোদার সহিত তাহার এক গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সে সৃষ্ট বস্তুনিচয় হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং খোদার মুকালামাত ও মুখাতেবাত অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্ভাষণ ও সম্বোধনের সম্মান লাভ করে। এই মর্যাদা লাভের দরজা এখনও খোলা আছে, যেমন পূর্বে খোলা ছিল। এখনও খোদা তাঁহার এই সকল নেয়ামত অন্বেষণকারীদেরকে দিয়া থাকেন, যেমন তিনি পূর্বে দিতেন। কিন্তু এই পথ শুধু মুখের কথায় পাওয়া যায় না এবং শুধু বাগাড়ম্বরের দ্বারা এই পথ লাভ হয় না এবং অসার কথা ও আত্মগর্বের দ্বারা এই দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। চায় অনেকে কিন্তু পায় অল্প

জনে। ইহার কারণ কি? বস্তুতঃ এই পর্যায় সত্যিকার কঠোর পরিশ্রম ও সত্যিকার আত্ম-নিয়োগের উপর নির্ভরশীল। কথা কিয়ামত পর্যন্ত বলিতে থাক; কি হইবে? আন্তরিক সততার সঙ্গে সেই অগ্নিতে পা রাখা, যাহার ভয়ে অন্যেরা পলায়ন করে, এই পথের প্রথম শর্ত। কার্যতঃ কঠোর পরিশ্রম বিনা মৌখিক কথা অসার। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○ (সূরা বাকারা, 2 : 187)

অর্থাৎ, "যদি আমার বান্দা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তিনি কোথায়, তবে তাহাদিগকে বলঃ তিনি তোমাদের নিকটেই আছেন। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনিয়া থাকি। সুতরাং, তাহাদের উচিত তাহারা যেন দোয়ার দ্বারা আমার মিলন প্রার্থী হয় এবং আমার উপর ঈমান আনে, তবেই তাহারা সফল হইবে" (২ঃ১৮৭)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থা কী হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, মৃত্যুর পরে মানুষের যে অবস্থা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন নূতন অবস্থা নহে। বরং ইহলৌকিক জীবনের অবস্থাসমূহ তথায় অধিক স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস ও কর্মের প্রকৃতি ভাল কিংবা মন্দ, তাহা ইহলোকে গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে থাকে এবং উহার বিষ প্রতিষেধক গুণ বা উহার বিষ মানুষের জীবনের উপর এক গোপন ক্রিয়া করে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এমন থাকিবে না। বরং ঐ সব গোপন অবস্থা সুস্পষ্টরূপে আপন মূর্তি দেখাইবে। ইহার নমুনা স্বপ্নজগতে পাওয়া যায়। মানব দেহে যে প্রকার পদার্থ প্রবল হয়, স্বপ্নে ঐ প্রকার দৈহিক অবস্থা দেখা যায়। যখন প্রবল জ্বরের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়, তখন স্বপ্নে অধিকাংশ স্থলে অগ্নি ও অগ্নিশিখা দেখা

যায়। শ্লেষ্মা জ্বর, বাত-জ্বর এবং সর্দির প্রাবল্যের ক্ষেত্রে মানুষ আপনাকে পানির মধ্যে দেখিতে পায়; বস্তুতঃ যে প্রকার রোগের জন্য দেহে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, ঐ সমুদয় অবস্থা রূপকভাবে স্বপ্নে দেখা যায়। সুতরাং স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্পর্কে চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবে যে, পরবর্তী জগতেও ইহাই আল্লাহ্তা'লার চিরাচরিত বিধান। কারণ স্বপ্ন যেমন আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়া আত্মিক অবস্থাকে দৈহিক আকারে রূপায়িত করিয়া প্রদর্শন করে, পরলোকেও তেমনি হইবে। তখন আমাদের কর্ম এবং কর্ম-ফল দৈহিক রূপ প্রাপ্ত হইবে এবং যাহা কিছু আমরা ইহলোক হইতে গুপ্তভাবে সঙ্গে লইয়া যাইব, ঐ সবই তখন আমাদের চেহারায় স্পষ্ট প্রকাশিত দেখা যাইবে। স্বপ্নে যেমন মানুষ নানা প্রকার রূপক বস্তু দেখিতে পায় এবং কখনও মনে করে না যে, ঐগুলি রূপক বস্তু বরং উহাদিগকে প্রকৃত জিনিষ বলিয়া জ্ঞান করে, তেমনি পরলোকেও হইবে। বরং খোদা রূপক দৃশ্যাবলী দ্বারা তাঁহার নূতন শক্তি ও মহিমা প্রদর্শন করিবেন। যেহেতু সেই শক্তি ও মহিমা পরিপূর্ণ, সেই জন্য আমরা যদি রূপকের নামও না লই এবং বলি যে, খোদার কুদরতে উহা নূতন জন্ম, তবেই এই বক্তব্য একান্ত সত্য, সঠিক ও যথার্থ হইবে। খোদা বলিতেছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ (সূরা সাজদা, 32 : 18)

অর্থাৎ, "কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি জানে না যে, তাহার জন্য কী কী নেয়ামত লুক্কায়িত আছে" (৩২ঃ১৮)। অতএব, খোদা এই সব নেয়ামতকে গুপ্ত বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে উহাদের নমূনা নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর নেয়ামত আমাদের নিকট গোপন নহে। দুগ্ধ, আনার, আঙ্গুর প্রভৃতি জিনিষকে আমরা জানি এবং সদা-সর্বদা এই সব জিনিষ খাই। সুতরাং, ইহা সহজবোধ্য যে, ঐ সমুদয় জিনিষ অন্য কিছু। ঐগুলির সঙ্গে এই সকল জিনিষের যে মিল, তাহা শুধু নামেই। সুতরাং, **যে ব্যক্তি বেহেশ্তকে পার্থিব জিনিষের সমাহার বলিয়া বুঝিয়াছে, সে কুরআন শরীফের এক অক্ষরও বোঝে নাই।**

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, বেহেশ্ত ও উহার নেয়ামত হইতেছে

এমন সব জিনিস, যাহা কখনও কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোনো হৃদয় ধারণা করে নাই। অথচ আমরা পার্থিব নেয়ামতসমূহ চোখেও দেখি, কানেও শুনি এবং মনের মধ্যেও ঐগুলি উপলব্ধ হয়। সুতরাং, যেহেতু খোদা ও তাঁহার রসূল এই সমুদয় জিনিষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া প্রকাশ করেন, সেহেতু আমরা তখন কুরআন হইতে দূরে চলিয়া যাই, যখন মনে করি যে, বেহেশ্‌তেও পৃথিবীরই দুগ্ধ থাকিবে যাহা গাভী, ও মহিষ দোহনে পাওয়া যায়। প্রকারান্তরে ইহাতে একথা স্বীকার করা হয় যে, সেখানে দুগ্ধ প্রদায়িনী পশুর পালসমূহ মজুদ থাকিবে, বৃক্ষে মধু মক্ষিকারা বহু মৌচাক তৈরী করিবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ অনুসন্ধান করিয়া সেই মধু সংগ্রহ করিয়া নদ-নদীতে ঢালিয়া দিবে। ইত্যাকার ধারণার সঙ্গে কি সেই শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য আছে, যেখানে এই আয়াতসমূহে রহিয়াছে যে, পৃথিবীবাসী কখনও ঐ সব জিনিষ দেখে নাই এবং ঐসব জিনিষ আত্মাকে আলোকিত করে, খোদার মা'রেফত বৃদ্ধি করে এবং ঐগুলি আধ্যাত্মিক খাদ্য, যদিও ঐ সকল খাদ্যের সামগ্রিক চিত্র বাস্তবের রঙে প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এগুলির মূল উৎপত্তিস্থল আত্মা ও সত্যতা। কেহ যেন মনে না করে যে, কুরআন করীমের নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতে একথা পাওয়া যায় যে বেহেশ্‌তে যে সমুদয় নেয়ামত দেওয়া হইবে, ঐ নেয়ামতগুলি দেখিয়া বেহেশ্‌তবাসী মানুষ চিনিয়া ফেলিবে এবং বলিবে যে, এই সব নেয়ামত তাহারা পূর্বেও প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ

(সূরা বাকারা, 2 : 26)

অর্থাৎ, "যাহারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে এবং যাহাদের মধ্যে কোন দোষ নাই, তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহারা ঐ বেহেশ্‌তের উত্তরাধিকারী, যাহার নীচে নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত। যখন

তাহারা পরলোকে ঐ সকল বৃক্ষের ঐ সব ফল পাইবে, যাহা তাহারা ইহলোকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন তাহারা বলিবে ঃ ইহা সেই সকল ফল, যাহা পূর্বেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কারণ তাহারা এই ফলগুলিকে পূর্বের ফলের অনুরূপ দেখিবে" (২ঃ২৬)। এখন এই প্রকার ধারণা যে, পূর্বেকার ফল দ্বারা পৃথিবীর জড় সম্পদকেই বুঝায়, সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইহা আয়াতের স্পষ্ট অর্থের বর্ণনা এবং যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন যে, যাহারা ঈমান আনে এবং সময়োপযোগী সৎকর্ম করে, তাহারা স্বহস্তে এক বেহেশ্‌ত তৈরী করে। উহার বৃক্ষ ঈমান। উহার নদ-নদীসমূহ আমলে সালেহ। এই বেহেশ্‌তের ফলই তাহারা ভবিষ্যতে (পরকালে) খাইবে এবং সেই ফল অধিক স্পষ্ট ও সুস্বাদু হইবে এবং তাহারা আধ্যাত্মিক দিক হইতে এই ফলই পৃথিবীতে খাইয়াছে বলিয়া পরলোকে ঐ সকল ফল চিনিতে পারিবে এবং বলিবে যে, এই সকল তো সেই ফলই মনে হয়, যাহা ইতিপূর্বে তাহারা আহার করিয়াছে এবং এই ফলকে পূর্ববর্তী সেই ফলের সদৃশ দেখিতে পাইবে। সুতরাং, এই আয়াত স্পষ্ট বলিতেছে যে, পৃথিবীতে যাহারা খোদার প্রেম ও ভালবাসার খাদ্য গ্রহণ করিত; এখন বাস্তব আকারে সেই খাদ্যই তাহারা পাইবে। তাহারা প্রেম ও প্রীতির স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার মর্ম জানে বলিয়া তাহাদের আত্মার নিকট ঐ সময়ের স্মৃতি জাগ্রত হইবে, যখন তাহারা নির্জনে গৃহ-কোণে এবং রাত্রির অন্ধকারে প্রেম- ভরে আপন প্রকৃত প্রেমাস্পদকে স্মরণ করিত এবং সেই স্মরণে অনুপম আনন্দে বিভোর হইত।

বস্তুতঃ, এখানে জড় খাদ্যের কোনও উল্লেখ নাই। যদি কাহারও মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আধ্যাত্মিক উপায়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এই খাদ্য পৃথিবীতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে একথা বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে যে, ঐগুলি এমন নেয়ামত, যাহা পৃথিবীতে কেহ দেখে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কাহারও হৃদয় কল্পনা করে নাই? এরূপ অবস্থায় এই আয়াত দুইটিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে অনৈক্য তখনই হইত, যখন এই আয়াতে পার্থিব নেয়ামত বুঝানো হইত। কিন্তু এখানে পার্থিব নেয়ামত বুঝানো হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানী

তত্ত্বজ্ঞানের রঙে যাহা পাইয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা অন্য জগতের নেয়ামত, যাহার নমুনা আগ্রহ সৃষ্টির জন্য পূর্বেই দেওয়া হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, খোদাপ্রাপ্ত মানুষ পৃথিবীর নহেন। এই কারণেই পৃথিবীবাসী তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তিনি আকাশের। এ জন্য তিনি ঐশী নেয়ামত প্রাপ্ত হন। পৃথিবীর মানুষ পার্থিব নেয়ামত প্রাপ্ত হয় এবং আকাশের মানুষ ঐশী নেয়ামত প্রাপ্ত হন। সুতরাং, ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, ঐ সমুদয় নেয়ামত পৃথিবীবাসীর কর্ণ, পৃথিবীবাসীর হৃদয় এবং পৃথিবীবাসীর চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহার পার্থিব জীবনের উপর মৃত্যু আসে, তাঁহাকে সেই পেয়ালা রূহানীভাবে পান করান হয়, যাহা পরলোকে তাঁহাকে বাস্তব আকারে পান করান হইবে। যখন তাঁহাকে একই পাত্র পরলোকে বাস্তব আকারে দেওয়া হইবে, তখন ইহলোকের পানের কথাই তাঁহার স্মরণ হইবে কিন্তু ইহাও সত্য যে, তিনি পার্থিব চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতিকে এই নেয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ জ্ঞান করিবেন। কেননা, পৃথিবীতে থাকিয়াও যেহেতু তিনি পৃথিবীতে ছিলেন না সেহেতু তিনিও সাক্ষ্য দিবেন যে, ঐ সমুদয় নেয়ামত পার্থিব নেয়ামতের মধ্য হইতে নহে। পৃথিবীতে তাঁহার চক্ষু এই প্রকার নেয়ামত দর্শন করে নাই, কর্ণ তাহা শ্রবণ করে নাই এবং হৃদয়ও কখনও ধারণা করে নাই। তবে এক ভিন্ন জীবনে ঐগুলির নমুনা দেখিয়াছিলেন, যাহা পৃথিবীর মধ্য হইতে ছিল না, বরং তাহা ছিল অনাগত জগতের সংবাদ বহনকারী এবং উহারই (পরলোকের) সঙ্গে ছিল উহার (সংবাদ বহনকারীর) সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক। পৃথিবীর সহিত উহার কোনই সম্পর্ক ছিল না।

পরলোক সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত তিনটি তত্ত্ব ঃ মা'রেফত

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর যে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, সামগ্রিক বিধান হিসাবে কুরআন শরীফ ঐগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। পরকাল সম্বন্ধে কুরআনের এই তিন তত্ত্বকে লইয়া আমরা পৃথক পৃথক আলোচনা করিব।

মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সূক্ষ্ম কথা

১। তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সূক্ষ্ম কথা এই যে, কুরআন শরীফে বার বার ইহাই বলা হইয়াছে যে, পরকাল নূতন কোন জিনিষ নহে। বরং উহার সম্যক প্রকাশ এই পার্থিব জীবনেরই প্রতিচ্ছায়া ও স্মৃতিস্বরূপ হইবে যেমন, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 14)

অর্থাৎ, "আমরা ইহলোকেই প্রত্যেকের কর্মফল তাহার ঘাড়ে বাঁধিয়া দিই এবং ঐ সমুদয় লুক্কায়িত ফল আমরা কিয়ামতের দিন প্রকাশ করিয়া দিব এবং এক খোলা কর্মলিপির আকারে দেখাইব" (১৭ঃ১৪)। এই আয়াতে তায়ের طائر শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। জানা আবশ্যক যে, আসলে পাখীকে তায়ের বলে। তাহা ছাড়া, রূপক অর্থে ইহা দ্বারা কর্মকেও বুঝায়। কারণ প্রত্যেক কর্ম ভাল হউক বা মন্দ, সম্পাদিত হওয়ার পর, পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যায়। উহার কষ্ট বা সুখ লয় পাইয়া যায় এবং উহার শুধু পবিত্রতা বা অপবিত্রতা হৃদয়-ফলকে অবশিষ্ট রহিয়া যায়।

ইহা কুরআনের মূলনীতি যে, প্রত্যেক কর্মের চিত্র সংগোপনে স্তূপীকৃত হইতে থাকে। মানুষের কর্ম যে প্রকারের, উহার অনুরূপ এক ক্রিয়া খোদাতা'লার পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ ক্রিয়া এই পাপ বা পুণ্যকে নষ্ট হইতে দেয় না, বরং উহার ছাপ হৃদয়ে, মুখে, চোখে, কানে, হাতে, পায়ে অঙ্কিত হইতে থাকে এবং ইহাই গুপ্ত আমলনামা, যাহা পারত্রিক জীবনে খোলাখুলিভাবে পরিদৃষ্ট হইবে। তারপর, অন্যত্র বেহেশ্‌তবাসী সম্বন্ধে বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

(সূরা হাদীদ, 57 : 13)

অর্থাৎ, "সেই দিবসেও ঈমানের আলোক, যাহা গুপ্তভাবে মোমেনগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, খোলাখুলিভাবে তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান

দিক দিয়া দৌড়াইতে দেখিতে পাইবে" (৫৭ঃ১৩)। তারপর, অন্য স্থানে দুষ্কৃতকারীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

(সূরা তাকাসুর, 102 : 2-9)

অর্থাৎ, "দুনিয়ার সীমাহীন লোভ-লালসা তোমাদিগকে পারলৌকিক জীবনের অন্বেষণ হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। ঐ অবস্থাতেই তোমরা কবরে গিয়া স্থান লাভ করিয়াছ। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে যে, পৃথিবীর প্রতি আসক্তি ভাল নহে। আমি আবার বলিতেছি যে, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে যে, পৃথিবীর প্রতি আসক্তি ভাল নহে। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে, তবে তোমরা দোযখকে ইহলোকেই দেখিতে পাইতে। তারপর আলমে বরযখে (বা মধ্যলোকে) দৃঢ় প্রত্যয়ের চোখে দেখিবে। তারপর, পুনরুত্থানলোকে পূর্ণ হিসাব-নিকাশে ও শাস্তিতে পড়িবে। শাস্তি তোমাদের উপর সর্বতোভাবে নিপতিত হইবে এবং শুধু কথার দ্বারা নহে বরং কার্যতঃ তোমাদের দোযখের জ্ঞান লাভ হইয়া যাইবে" (১০২ঃ২-৯)।

তিন প্রকারের জ্ঞান ঃ

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্তা'লা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, ইহলোকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকগণের জন্য নারকীয় জীবন গোপনভাবে থাকে। চিন্তা করিলে তাহারা তাহাদের দোযখ ইহলোকেই দেখিতে পাইবে। এখানে আল্লাহ্তা'লা জ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা, ইলমুল একীন (যৌক্তিক জ্ঞান), আইনুল একীন (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) এবং হাক্কুল একীন (অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত জ্ঞান)। সর্বসাধারণের বুঝিবার জন্য এই তিন প্রকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ যদি কোন ব্যক্তি দুর হইতে কোথাও কোন ধোঁয়া দেখে তখন ধোঁয়া হইতে তাহার ধারণা অগ্নির দিকে চলিয়া যায় এবং এই ভাবিয়া সে সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব নির্ধারণ

করে যে অগ্নি ও ধোঁয়ার মধ্যে অচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে ধোঁয়া থাকিবে সেখানে অবশ্যই অগ্নিও থাকিবে। এই জ্ঞানের নামই ইলমুল একীন বা যৌক্তিক জ্ঞান। তারপর অগ্নিশিখা দর্শনে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আইনুল একীন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ঐ অগ্নিতে নিজে প্রবেশ করিলে যে জ্ঞান হয়, উহার নাম হাক্কুল একীন বা অভিজ্ঞতা লব্ধ নিশ্চিত জ্ঞান। এখন আল্লাহ্তা'লা বলেন, জাহান্নামের যুক্তিমূলক একীন ইহলোকেই সম্ভবপর। বরযখলোকে আইনুল একীন লাভ হইবে এবং হাশরে (পুনরুত্থান লোকে) ঐ জ্ঞান হাক্কুলএকীনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছাইবে।

তিন জগৎ

এখানে জানা প্রয়োজন যে, কুরআন করীমের শিক্ষার দিক দিয়া তিন জগৎ সাব্যস্ত হয় ঃ

(১) **প্রথম জগৎ (ইহলোক)। ইহার নাম আলমে কাসাব** (উপার্জনের জগৎ) এবং নাশায়াতে উলা (প্রথম সৃষ্টি)। এই জগতেই মানুষ পুণ্য বা পাপ করে। যদিও আলমে বা'স বা পুনরুত্থানের জগতে পুণ্যের উন্নতি আছে, কিন্তু তাহা শুধু খোদার অনুগ্রহে, মানুষের উপার্জনের তাহাতে কোন দখল নাই।

(২) **দ্বিতীয় জগতের নাম বরযখ**। মূলতঃ (بَرزخ) (বরযখ) আরবী ভাষায় দুই জিনিষের অন্তবর্তী বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যেহেতু এই যামানা পুনরুত্থান জগৎ ও ইহজগতের মধ্যে অবস্থিত সেহেতু ইহার নাম বরযখ। কিন্তু শব্দটি আদিকাল হইতেই এবং দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি মধ্যবর্তী জগতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে এই শব্দে অন্তবর্তী জগতের অস্তিত্বের এক আজিমুশ্শান সাক্ষ্য নিহিত আছে। আমরা মিনানুর রহমান (منن الرحمٰن) পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছি যে, আরবী শব্দগুলি খোদার মুখ নিঃসৃত শব্দ। পৃথিবীতে শুধু ইহাই একমাত্র ভাষা, যাহা পবিত্র খোদার ভাষা এবং প্রাচীন ও যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ইহা সব ভাষার জননী। ইহা খোদার ওহীর প্রথম ও শেষ বাহন। খোদার ওহীর প্রথম তখ্তগাহ্ (সিংহাসন) এই জন্য যে, সমগ্র আরবী ছিল খোদার

কথা, যাহা আদি হইতে খোদার সঙ্গে ছিল। অতঃপর, সেই কথা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীবাসী উহা হইতে তাহাদের ভাষাগুলি তৈরী করে। আরবী ভাষা খোদার আখেরী তখ্‌তগাহ্‌ এই জন্য নির্ণীত হয় যে, খোদাতা'লার শেষ পুস্তক কুরআন শরীফ আরবীতে নাযেল হইয়াছে। বস্তুতঃ, আরবী বরযখ শব্দ বর (بَرْ) ও যখ (زَخْ) লইয়া গঠিত; ইহার অর্থ কর্মের দ্বারা অর্জন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং উহা এক গুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছে। বরযখের অবস্থা সেই অবস্থা, যখন মানুষের এই নশ্বর মানবীয় গঠন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। দেহ পৃথক হইয়া যায় এবং আত্মা পৃথক হইয়া যায়। দেখা যায়, দেহকে কোনো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। আত্মাও এক প্রকার গর্তে গিয়া পড়ে। زَخْ (যখ) দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ সে ভাল বা মন্দ কোন কর্ম করিতে সক্ষম নয়। কর্ম কেবল দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকতেই প্রকাশিত হইত। স্পষ্ট কথা, আমাদের আত্মার উত্তম স্বাস্থ্য দেহের উপর নির্ভর করে। মস্তিষ্কের কোন স্থান বিশেষে আঘাত লাগিলে স্মৃতিহানি ঘটে এবং অন্য অংশ বিপন্ন হইলে চিন্তা শক্তি বিদায় গ্রহণ করে এবং চৈতন্য লোপ পায়। মস্তিষ্কে কোন প্রকার সংকোচন বা প্রদাহ ঘটিলে, কিংবা রক্ত বা অন্য কোন জিনিষ জমিয়া আংশিক বা পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থি জন্মাইলে, অচিরাৎ মূর্চ্ছা বা মৃগীর আক্রমণ হয়। সুতরাং, আমাদের চির অভিজ্ঞতা আমাদিগকে নিশ্চিত শিক্ষা দেয় যে, আমাদের আত্মা দেহের সম্বন্ধ ছাড়া সম্পূর্ণ অকেজো। সুতরাং, আমরা যদি মনে করি যে, কোন সময় আমাদের দেহহীন আত্মা, যাহার সহিত দেহ নাই, কোন আনন্দময় অবস্থা পাইতে পারে, তবে ইহা আমাদের অলীক ধারণা। গল্প হিসাবে ইহা গ্রহণ করিলেও, যুক্তি কখনও ইহার সমর্থন করে না। আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না যে, আমাদের যে আত্মা দেহের সামান্য সামান্য বিশৃঙ্খলায় বেকার হইয়া পড়ে, উহা সেই দিন কি প্রকারে পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকিবে, যখন উহা দেহের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবে। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা দ্বারা কি আমরা বুঝিতে পারি না যে, আত্মা সুস্থ থাকার জন্য দেহের সুস্থতা আবশ্যক? আমাদের মধ্যে কেহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মা বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার জীবনের সম্যক মূলধন বার্ধক্য-চোরে চুরি করিয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লা বলেনঃ

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط (সূরা হজ্জ, 22 : 6)

অর্থাৎ, "মানুষ বৃদ্ধ হইয়া এমন অবস্থায় গিয়া পৌঁছায় যে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পর সে আবার মূর্খে পরিণত হয়" (২২ঃ৬)। সুতরাং আমাদের এই সকল অভিজ্ঞতা এই কথার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ যে, দেহ ছাড়া আত্মা ক্রিয়াশীল নহে। তারপর এই ধারণাও মানুষকে প্রকৃত সত্যের দিকে মনোযোগী করিতেছে যে, দেহ ছাড়া আত্মা কোন কাজের জিনিষ হইলে, খোদাতা'লার এই ক্রিয়া বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইত যে, তিনি অযথা ইহাকে নশ্বর দেহের সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর খোদাতা'লা যে মানুষকে অসীম উন্নতির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও ভাবিবার বিষয়। সুতরাং মানুষ যখন এই সংক্ষিপ্ত জীবনের উন্নতিও দেহের সাহচর্য ছাড়া করিতে পারে না, তখন কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে যে, সেই অশেষ উন্নতি, যাহা সীমাহীন, তাহা দেহের সাহচর্য ব্যতীত একাই অর্জন করিবে?

সুতরাং, এই সকল যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মার পরিপূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশের জন্য ইসলামী মূলনীতির দিক হইতে দেখা যায়, আত্মার সহিত দেহের সাহচর্য অপরিহার্য। যদিও মৃত্যুর পর এই নশ্বর দেহ আত্মা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে তথাপি বরযখলোকে প্রত্যেক আত্মা এক সীমা পর্যন্ত তাহার কর্মের স্বাদ গ্রহণের জন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেহ এই দেহের মত নহে। বরং কর্ম অনুযায়ী উহা এক প্রকার আলোক বা আঁধার হইতে তৈরী হয়। অন্য কথায় **আলমে বরযখে মানুষের কর্মের অবস্থা দেহের কাজ করে**। খোদার কালামে বার বার উল্লেখ আছে যে, কোন কোন দেহকে আলোকময় এবং কোন কোন দেহকে অন্ধকারময় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যাহা কর্মের আলোক বা কর্মের আঁধার দিয়া তৈরী হইয়া থাকে। যদিও এই রহস্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিন্তু ইহা যুক্তি বিরোধী নহে। পরিপূর্ণ মানুষ ইহলৌকিক জীবনেই জড়দেহ ছাড়াও এক আলোক সত্তা পাইতে পারেন। মুকাশেফাত বা দিব্য-দর্শন জগতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শুধু একটা স্থূল বুদ্ধির সীমানায় যাইয়া যাহাদের বুদ্ধি থামিয়া গিয়াছে, তাহাদের মত মানুষকে বুঝানো কঠিন হইলেও, যাঁহারা মুকাশেফাত-জগৎ হইতে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা

এই প্রকারের কর্ম হইতে দেহ গঠিত হওয়াকে আশ্চর্যজনক বা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করিবেন না, বরং তাঁহারা এই আলোচনায় আনন্দ লাভ করিবেন।

বস্তুতঃ, সেই যে দেহ, যাহা কর্মের প্রকৃতি হইতে মিলিবে, উহাই বরযখ জগতে, সাধু ও অসাধু ব্যক্তির প্রতিফল প্রাপ্তির কারণ হইবে। এই বিষয়ে আমার নিজ অভিজ্ঞতা আছে। কাশ্‌ফযোগে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমি অনেক বার অনেক মৃত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছি। কোন কোন পাপী ও বিপথগামীর দেহ এমন কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়াছি, যেন তাহা ধুম্র হইতে তৈরী হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে এবং আমি জোর দিয়া বলিতেছি যে, খোদাতা'লা যেভাবে বলিয়াছেন সেইভাবেই মৃত্যুর পর প্রত্যেকে নিশ্চয় আলোকময় বা অন্ধকারময় দেহ পায়। মানুষ ভুল করিবে যদি সে এইসব অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব শুধু যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহে। বরং জানা উচিত, চক্ষু যেমন মিষ্টি জিনিষের স্বাদ বলিতে পারে না এবং জিহ্বা কোন জিনিষ দেখিতে পারে না, তেমনই পারলৌকিক জ্ঞান, যাহা পবিত্র মুকাশেফাত দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুধু যুক্তির দ্বারা উহার রহস্য ভেদ করা যাইতে পারে না। খোদাতা'লা এই পৃথিবীতে অজানা জিনিষ জানার জন্য পৃথক পৃথক উপায় রাখিয়াছেন অতএব, প্রত্যেক বিষয়েই উহার জন্য নির্দিষ্ট উপায় অন্বেষণ কর, তবেই উহা পাইবে।

আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যাহারা কুকার্যে লিপ্ত এবং বিপথগামী, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া খোদাতা'লা তাঁহার কালামে অভিহিত করিয়াছেন এবং সৎকর্মশীলগণকে জীবিত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, খোদা সম্বন্ধে গাফেল থাকিয়া যাহারা মরে, তাহাদের জীবনের সরঞ্জাম, যাহা পানাহার ও কামাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় এবং আধ্যাত্মিক খোরাকে তাহাদের কোনও অংশ না থাকায়, সত্যই তাহারা মৃত, এবং তাহারা শুধু শাস্তি পাওয়ার জন্যই জীবিত হয়। এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

(সূরা ত্বহা, 20 : 75)

অর্থাৎ, "অপরাধী হইয়া যে ব্যক্তি খোদার নিকট আসিবে, অনন্তর তাহার গন্তব্যস্থল জাহান্নাম হইবে। সে উহাতে মরিবেও না, জীবিতও থাকিবে না" (২০:৭৫)। কিন্তু যাঁহারা খোদার প্রেমিক, তাঁহারা মৃত্যুতে মরেন না। কারণ তাঁহাদের পানি ও রুটি তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। তারপর, বরযখের পরবর্তী যুগের নাম আলমে বা'স عالم بعث বা পুনরুত্থানলোক। এই সময়ে প্রত্যেক আত্মা ভাল হউক বা দুষ্ট, সাধু হউক বা অসাধু খোলাখুলিভাবে এক দেহ লাভ করিবে। ঐদিন খোদার সেই সার্বিক জ্যোতির্বিকাশের জন্য নির্ধারিত, যখন প্রত্যেক মানুষ তাহার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান লাভ করিবে এবং প্রত্যেকেই তাহার কর্মফলের শেষ সীমানায় পৌঁছাইবে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, খোদা ইহা কী প্রকারে করিবেন? কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কুদরত ও মহিমার মালিক। তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○ وَضَرَبَ لَنَا
مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ
اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○ (সূরা ইয়াসীন, 36:78-80)

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○
فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ (সূরা ইয়াসীন,36:82-84)

অর্থাৎ, "মানুষ কি দেখে নাই যে, আমরা তাহাকে এক বিন্দু পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। যাহা গর্ভাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর উহা এক ঝগড়াটে মানুষে পরিণত হইল। আমার সম্বন্ধে কথার জাল বুনিতে লাগিল। সে তাহার জন্মকথা ভুলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল ঃ ইহা কী

প্রকারে সম্ভব যে, যখন মানুষের অস্থিসমূহও অবিকৃত থাকিবে না, তখন আবার সে পুনর্জীবন লাভ করিবে! তাহাদিগকে বল ঃ তিনিই জীবিত করিবেন, যিনি তাহাদিগকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার এবং সর্বদিক হইতে জীবিত করিতে জানেন। তাঁহার আদেশের এমন মহিমা যে, যখন তিনি কোন জিনিসের হওয়া চাহেন, তখন তিনি শুধু ইহাই বলেন, 'হও', এবং ঐ জিনিস সৃষ্টি হইয়া যায়। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, সকল বস্তুর উপর যাহার কর্তৃত্ব। তোমরা সকলেই তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে" (৩৬ঃ৭৮-৮০; ৮২-৮৪)। সুতরাং, এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন যে, তাঁহার নিকট কোন জিনিস না হওয়ার নহে। যিনি এক তুচ্ছ বিন্দু হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি পুনর্বার তাহাকে সৃষ্টি করিতে অক্ষম?

এখানে আরও একটি প্রশ্ন অজ্ঞদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উহা এই যে, যেহেতু তৃতীয় জগৎ অর্থাৎ আলমে বা'আস-পুনরুত্থান দিবস যখন দীর্ঘকাল পরে আসিবে, তখন সৎ ও অসৎ সকলের পক্ষে আলমে বরযখ, যাহা একটা হাজত গৃহের অনুরূপ, তথায় বিচারের অপেক্ষায় থাকা একটা বাজে কথা বলিয়া মনে হয়। ইহার উত্তর এই ঃ এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইহা শুধু অজ্ঞতার ফলে জন্মে। বরং খোদার কেতাবে সৎ ও অসতের প্রতিফলের জন্য দুই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হইল বরযখ, যেখানে গোপনে প্রত্যেকে তাহার প্রতিফল ভোগ করিবে। দুষ্ট লোকেরা মৃত্যুর পরে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সাধুগণ মৃত্যুর পরে জান্নাতে আরাম ভোগ করিবেন। বস্তুতঃ, এই প্রকার আয়াত কুরআন শরীফে অনেক আছে যে, মৃত্যুর পরক্ষণে প্রত্যেক মানুষ তাহার কর্মফল দর্শন করে। দৃষ্টান্ত স্থলে খোদাতা'লা এক বেহেশ্তবাসীর সম্বন্ধে খবর বলিতেছেন ঃ

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط (সূরা ইয়াসীন, 36 : 27)

অর্থাৎ, "তাহাকে বলা হইল ঃ তুমি বেহেশ্তে প্রবেশ কর" (৩৬ঃ২৭)। অনুরূপভাবে এক দোযখীর সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন ঃ

فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ○ (সূরা সাফ্ফাত, 37 : 56)

অর্থাৎ, "এক বেহেশ্‌তবাসীর এক দোযখী বন্ধু ছিল। যখন উহারা দুইজনেই মারা গেল, তখন বেহেশ্‌তবাসী তাহার বন্ধু কোথায় জানার জন্য ব্যাকুল হইল। অতঃপর, দেখান হইল যে, সে জাহান্নামে আছে (৩৭ঃ৫৬)।" সুতরাং পুরস্কার ও শাস্তির কার্য অবিলম্বে শুরু হইয়া যায়। দোযখী দোযখে বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে যায়। কিন্তু ইহার পরে আরও এক উচ্চ ও উন্নত জ্যোতির্বিকাশের দিন আছে। খোদার মহান প্রজ্ঞা ঐ দিনকে প্রকাশ করিবার তাগিদ দিয়াছে। কারণ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তিনি স্রষ্টা বলিয়া পরিচিত হন। অতঃপর, তিনি সকলকে ধ্বংস করিবেন, যেন তিনি প্রতাপান্বিত কাহ্‌হার বলিয়া পরিচিত হন। তারপর একদিন সকলকে পূর্ণ জীবন দিয়া একই ময়দানে সমবেত করিবেন, যেন তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়া পরিচিত হন। এখন জানা আবশ্যক, পূর্বোল্লিখিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর মধ্যে ইহাই প্রথম মা'রেফত ও সূক্ষ্মতত্ত্ব - যাহার আলোচনা করা হইল।

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব, যাহাকে আলমে মাআদ বা পরলোকের জীবন বলে, সে সম্বন্ধে কুরআন শরীফে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা এই যে, আলমে মাআদে, ইহলোকে যে সমুদয় বিষয় আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্যমান ছিল, ঐ সকলই রূপ পরিগ্রহ করিবে। আলমে মাআদ সম্পর্কে বরযখ পর্যায়ের হইক বা আলমে বাস পর্যায়ের হউক, খোদাতা'লা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি আয়াত এই ঃ

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল, 17 : 73)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহলোকে অন্ধ থাকিবে সে পরলোকেও অন্ধ হইবে (১৭ঃ৭৩)। এই আয়াতে ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, ইহলোকের

আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব পরলোকে দৈহিকরূপে পরিদৃষ্ট ও অনুভূত হইবে। তদ্রূপ, অন্য আয়াতে বলেন ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ○ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ○ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا

فَاسْلُكُوْهُ ؕ (সূরা হাক্কা, 69 : 31-33)

অর্থাৎ, "এই জাহান্নামীকে পাকড়াও কর। তাহার গলায় বেড়ি পরাও, তারপর তাহাকে দোযখে জ্বালাও। তারপর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে উহাকে আবদ্ধ কর" (৬৯ঃ৩১-৩৩)। জানা আবশ্যক, এই আয়াতগুলিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার রূহানী আযাব, আলমে মাআদে সাকারে প্রকাশিত হইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে, গলার হাড়কাঠ পার্থিব লোভ-লালসা, যাহা মানুষের মাথাকে ভূমির দিকে অবনত করিয়া রাখিয়াছিল, উহা পরজগতে বাহ্যিক হাড়কাঠ আকারে দেখা যাইবে। তেমনই ইহকালে সংসারের আবদ্ধতার শিকল পরলোকে পায়ে বেড়ীর আকারে দেখা দিবে এবং পার্থিব আকাঙ্খা ও লোভ-লালসার জ্বালা প্রকাশ্য এবং জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নিরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে। পাপাচারী মানুষ ইহলৌকিক জীবনে কামনা-বাসনার এক জাহান্নাম স্বীয় অন্তরে বহন করিয়া ফিরে এবং অকৃতকার্যতার মধ্যে এই জাহান্নামের জ্বালা অনুভব করে। অতঃপর যখন সে নশ্বর বাসনা-কামনা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং যখন তাহাকে নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করিবে, তখন খোদাতা'লা তাহার হা-হুতাশকে প্রকাশ্য অগ্নিরূপে তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন। তিনি বলেন ঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ (সূরা সাবা, 34 : 55)

অর্থাৎ, "তাহাদের এবং তাহাদের বাসনার বস্তুর মধ্যে যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাই আযাবের মূল হইবে" (৩৪ঃ৫৫)। অতঃপর 'সত্তর গজ শিকল দ্বারা বন্ধন কর', এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, পাপাচারী ব্যক্তি সাধারণতঃ সত্তর বছর জীবনপ্রাপ্ত হয়। বরং অনেক সময় সে এই পৃথিবীতে এই প্রকারে সত্তর বছর জীবন পায় যে, শৈশবের বয়স এবং বার্ধক্যের অক্ষমতার সময় বাদ দিয়াই উক্ত পরিমাণ স্পষ্ট ও সচল জীবন পাইয়া থাকে, যাহা বুদ্ধি ও পরিশ্রম সহকারে কার্যের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুর্ভাগা তাহার জীবনের উৎকৃষ্ট সত্তর বৎসরই পার্থিব বন্ধনের বাঁধনে কাটায় এবং এই নিগড় হইতে মুক্ত হইতে চাহে না।

সুতরাং খোদাতা'লা এই আয়াতে বলেন যে, এই সত্তর বৎসর যাহা সে পৃথিবীর বাঁধনে কাটাইয়াছিল, পরলোকে সত্তর গজ লম্বা এক শিকলের

আকারে মূর্ত হইবে। এক এক গজ শিকল এক এক বৎসরের নির্দেশক হইবে। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য, খোদাতা'লা তাঁহার দিক হইতে বান্দার প্রতি কোন বিপদ দেন না। বরং তিনি মানুষের আপন কুকর্মই তাহার সম্মুখে রাখেন।

তারপর, তাঁহার এই অমোঘ নিয়ম প্রকাশার্থে খোদাতা'লা অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۝

(সূরা মুরসালাত, 77 : 31-32)

অর্থাৎ, "হে পাপচারী ও বিপথগামী ব্যক্তিগণ! ত্রিকোণ ছায়ার দিকে চল, যাহার তিনটি শাখা আছে, অথচ উহারা ছায়ার কাজ দেয় না; এবং উত্তাপ হইতেও বাঁচাইতে পারে না" (৭৭ঃ৩১-৩২)। এই আয়াতে 'তিন শাখা' দ্বারা হিংস্রতা, পশুত্ব ও অলীক কল্পনা বুঝায়। যাহারা এই তিন প্রবৃত্তিকে নৈতিকতায় রূপায়িত করে না এবং উহাদিগকে সংযত রাখে না, তাহাদের এই প্রবৃত্তিগুলিকে কেয়ামতের দিন পল্লবহীন তিনটি শাখার আকারে খাড়া দেখানো হইবে। উহা পাপীগণকে উত্তাপ হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। বরং তাহারা উত্তাপে পুড়িতে থাকিবে। তারপর, অনুরূপভাবেই খোদাতা'লা তাঁহার একই বিধান প্রকাশে বেহেশ্‌তীদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

(সূরা হাদীদ, 57 : 13)

অর্থাৎ, "সেই দিন তুমি দেখিবে যে, মোমেনগণের সেই আলোক, যাহা ইহলোকে গুপ্তভাবে আছে, প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের সম্মুখে ও তাহাদের ডান দিকে দৌড়াইতে থাকিবে" (৫৭ঃ১৩)। তারপর আরও এক আয়াতে বলেন ঃ

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ (সূরা আলে-ইমরান, 3 : 107)

অর্থাৎ, "সেই দিন কোন কোন চেহারা শুভ্র ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং কোন কোন চেহারা কালো হইবে" (৩ঃ১০৭)।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ

(সূরা মুহাম্মদ, 47 : 16)

অর্থাৎ, "সেই বেহেশ্‌ত যাহা পরহেযগারগণকে দেওয়া হইবে, উহার দৃষ্টান্ত একটি বাগানের ন্যায়। উহাতে পানির নহরসমূহ আছে, যাহা কখনও দূষিত হয় না। উহাতে দুগ্ধের নদীসমূহ আছে, যাহার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয় না। উহাতে শরাবের নদীসমূহ আছে, যাহা পূর্ণ আনন্দ দান করে এবং উহাতে নেশা নাই। উহাতে মধুর নহরসমূহ আছে, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কোন প্রকারের ময়লা উহাতে নাই" (৪৭ঃ১৬)। এখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বেহেশ্‌তকে তোমরা উপমা-স্থলে এই প্রকারের জ্ঞান কর যে, উহাতে ঐ সব জিনিষের কূলহীন নদীসমূহ আছে। তত্ত্বদর্শী আরেফগণ পৃথিবীতে রূহানীভাবে যে জীবনপ্রদ পানি পান করে, উহা সেখানে প্রকাশ্যভাবে বর্তমান আছে। যে আধ্যাত্মিক দুগ্ধে তাহারা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় রূহানীভাবে পৃথিবীতে প্রতিপালিত হয়, বেহেশ্‌তে উহাই প্রকাশ্যভাবে দৃষ্ট হইবে। খোদার যে প্রেম মদিরায় তাহারা ইহলোকে সর্বদা আধ্যাত্মিকভাবে মত্ত থাকিত, এখন বেহেশ্‌তে প্রকাশ্যভাবে উহার নদীসমূহ দৃশ্যমান হইবে। ঈমানের সুধা-মধু, যাহা ইহলোকে আধ্যাত্মিকভাবে তত্ত্বজ্ঞানী আরেফগণের মুখে প্রবেশ করিত, বেহেশ্‌তে তাহা অনুভূত ও প্রকাশিত নদীসমূহের আকারে পরিদৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক বেহেশ্‌তবাসী তাহার নদ-নদী ও বাগানসমূহ সম্বলিত আধ্যাত্মিক অবস্থাকে প্রকাশ্যভাবে উন্মুক্ত করিয়া সাকারে দেখাইয়া দিবে। খোদাও সেই দিন বেহেশ্‌তীগণের জন্য অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। বস্তুতঃ রূহানী অবস্থা গুপ্ত থাকিবে না, বরং সাকারে দেখা যাইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের তৃতীয় সূক্ষ্ম কথা

তৃতীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব এই যে, পরলোকে উন্নতির শেষ নাই। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (সূরা তাহরীম, 66 : 9)

অর্থাৎ, "পৃথিবীতে যাহাদের ঈমানের আলো ছিল, তাহাদের আলো কেয়ামতের দিন তাঁহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে দৌড়াইতে থাকিবে। তাহারা সর্বদা ইহাই বলিবে ঃ হে খোদা! আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও এবং তোমার মাগফেরাতের মধ্যে আমাদিগকে গ্রহণ কর। তুমি সব কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান" (৬৬ঃ৯)।

এই আয়াতে যে বলা হইয়াছে- তাহারা সর্বদা ইহাই বলিতে থাকিবে, আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও- ইহা অসীম উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। অর্থাৎ, আলোর এক পূর্ণ-স্তর লাভ করিবার পর, আর এক স্তর তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহা দেখিয়া পূর্ব-স্তর অপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তখন তাহারা দ্বিতীয় স্তরের জন্য প্রার্থনা করিবে এবং উহা প্রাপ্ত হওয়ার পর এক তৃতীয় স্তর তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন উহা দেখিয়া তাহারা পূর্বের স্তরগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে এবং পুনরায় তাহারা আরও স্তরের আকাঙ্খা করিবে। ইহাই সেই উন্নতির আগ্রহ, যাহা اَتْمِمْ (আতমিম অর্থাৎ পূর্ণ কর) শব্দ হইতে প্রতিভাত হয়।

বস্তুতঃ এই প্রকারে অনন্ত উন্নতির ধারা চলিতে থাকিবে, কখনও অবনতি হইবে না এবং তাহারা বেহেশ্‌ত হইতে কখনও বিতাড়িত হইবে না। বরং প্রত্যহ তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহারা কখনও পিছনে হটিবে না। আর যে একটি কথা বলা হইয়াছে- 'তাহারা সর্বদা মাগফেরাত প্রার্থনা করিবে', ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশের পর মাগফেরাত তথা পাপ মোচনের আর কী বাকি থাকিল এবং যখন সকল অপরাধের ক্ষমা হইয়া গিয়াছে, তখন আবার এস্তেগফারের কী প্রয়োজন রহিল? ইহার উত্তর এই যে, **মাগফেরাতের প্রকৃত অর্থ অমার্জিত ও ত্রুটিযুক্ত অবস্থাকে নীচে দাবানো ও ঢাকিয়া দেওয়া**। সুতরাং বেহেশ্‌তবাসী উন্নতির চরম স্তর লাভ করিতে এবং পূর্ণ নূরে নিমজ্জিত

হইতে চাহিবে। তাহারা পরবর্তী অবস্থা দেখিয়া প্রথম অবস্থাকে অপূর্ণ জ্ঞান করিবে। অতএব, তাহারা চাহিবে যেন, প্রথম অবস্থাকে নীচে অবদমন করা হয়। অতঃপর, তৃতীয় উৎকৃষ্ট অবস্থা দেখিয়া দ্বিতীয় পূর্ণত্ব অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের মাগফেরাতের আকাঙ্খা জন্মিবে। অর্থাৎ সেই অপূর্ণতাকে নীচে লুপ্ত ও গুপ্ত করিতে চাহিবে। এই প্রকারে অনন্ত মাগফেরাতের আগ্রহ জীবিত থাকিবে। ইহা সেই মাগফেরাত ও ইস্তেগফার শব্দ, যাহা কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আপত্তি হিসাবে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে পেশ করিয়া থাকে। শ্রোতৃমন্ডলী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ইস্তেগফারের আকাঙ্খাই মানুষের গৌরব। যে ব্যক্তি নারীর গর্ভে জন্ম লইয়াছে, অথচ সদা-সর্বদার জন্য ইস্তেগফারকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করে নাই, সে কীট, মানুষ নহে। সে অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে। অপবিত্র সে, পবিত্র নহে।

এখন সংক্ষেপে কথা এই যে, কুরআন শরীফের পরিপ্রেক্ষিতে দোযখ এবং বেহেশ্‌ত উভয়ই প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হইবে। ঐগুলি এমন কোন নূতন সাকার জিনিস নহে, যাহা অন্য স্থান হইতে আসিবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, উভয় অবস্থা সাকারে দৃশ্যমান হইবে। কিন্তু ঐগুলি আসল আধ্যাত্মিকতার প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হইবে। আমরা এমন প্রকার বেহেশ্‌তকে স্বীকার করি না যে, শুধু দৈহিকভাবে এক যমীনে বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। আমরা এমন দোযখও স্বীকার করি না, যাহার মধ্যে প্রকৃতই গন্ধকের পাথর আছে। বরং **ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী ইহলোকে মানুষ যে সব কার্য করে, বেহেশ্‌ত ও দোযখ উহারই প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ।**

তৃতীয় প্রশ্ন

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং উহা লাভ করিবার উপায় কী?

উত্তর ঃ নানা প্রকৃতির মানুষ তাহাদের অদূরদর্শিতা বা চিত্তের সংকীর্ণতা বা ভীরুতায় তাহাদের জীবনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য

নির্বাচন করে এবং সেই উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব আকাঙ্খা ও বাসনা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহার পবিত্র গ্রন্থে মানবের জীবনের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ○ (সূরা যারিয়াত, 51 :57)

অর্থাৎ, "জিন্ন ও মানুষকে (উচ্চ স্তরের ও সাধারণ স্তরের মানুষকে) শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা যেন আমাকে চিনে এবং আমার উপাসনা করে" (৫১ঃ৫৭)।

সুতরাং এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা এবং তাঁহার হইয়া যাওয়া। ইহা জানা কথা, মানুষের সাধ্য নাই যে, সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নিজের ক্ষমতায় স্থির করিয়া লয়। কারণ মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসেও নাই এবং যাইবেও না। বরং সে এক সৃষ্ট জীব। যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সব প্রাণী অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট শক্তি তাহাকে দিয়াছেন, তিনি তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্যও নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মানুষ এই উদ্দেশ্য বুঝুক বা না বুঝুক, কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য, নিঃসন্দেহে খোদার উপাসনা, খোদার পরিচয় ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া। আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (সূরা আলে-ইমরান, 3 : 20)

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ... ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (সূরা রুম, 30 : 31)

অর্থাৎ, "যে ধর্মে খোদার তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ এবং তাঁহার এবাদত সর্বোৎকৃষ্ট,উহাই ইসলাম। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইসলাম রাখা হইয়াছে। খোদা মানুষকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইসলামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" অর্থাৎ, তিনি ইহা চাহিয়াছেন যে, মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহার উপাসনায়, আজ্ঞা পালনে ও প্রেমে নিমগ্ন হউক। এই জন্যই সেই সর্বশক্তিমান, দয়াল দাতা মানুষকে ইসলামোপযোগী যাবতীয় শক্তি দিয়াছেন। (৩ঃ২০, ৩০ঃ৩১)।

এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। আমরা ইহার ব্যাখ্যা কতকটা প্রথম প্রশ্নের তৃতীয় অংশেও লিখিয়াছি। কিন্তু এখন আমরা সংক্ষেপে শুধুই ইহাই বলিতে চাহি যে, মানুষকে যতগুলি অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে বা তাহাকে যে সকল শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ঐগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য খোদার মা'রেফত, খোদার উপাসনা ও খোদার প্রেম লাভ। এই কারণেই মানুষ পৃথিবীতে সহস্র সহস্র রকমের কারবার অবলম্বন করিয়াও, খোদা ছাড়া প্রকৃত সুখ কিছুতেই পায় না। বড় ধনপতি হইয়া, বড় পদ লাভ করিয়া, বড় ব্যবসায়ী হইয়া, বড় বাদশাহী পর্যন্ত পাইয়া, বড় দার্শনিক বলিয়া অভিহিত হইয়াও সে পরিশেষে, এই সমুদয় পার্থিব বন্ধন ছাড়িয়া সীমাহীন হতাশা ও আক্ষেপ লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সর্বদা তাহার হৃদয় তাহাকে সংসারে ডুবিয়া থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে থাকে। তাহার চালবাজী, ধোঁকাবাজী এবং অবৈধ কর্মে, তাহার বিবেক কখনও তাহার সহিত একমত হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ এই বিষয়টি এই প্রকারেও বুঝিতে পারে যে, সৃষ্ট বস্তু উহার শক্তির দ্বারা কোন উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম সাধন করিতে পারে, তারপর আর অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সর্বোচ্চ কর্মই তাহার সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, গরু মহিষের কাজ উত্তম হইতে উত্তম চাষ, পানি সেচন বা ভার বহন করা। ইহার অধিক তাহার শক্তি কিছুই প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, গো-মহিষের জীবনের উদ্দেশ্য এই তিন জিনিস। ইহার অধিক কোন শক্তি উহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা যখন মানুষের শক্তি লইয়া গবেষণা করিয়া দেখি, তাহার যেসব শক্তি আছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি কী, তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মহান ও পরাৎপর খোদার অন্বেষণ তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। এমন কি, সে চাহে যে, খোদার প্রেমে সে এমনই বিভোর ও বিলীন হউক, যেন তাহার নিজের বলিতে কিছুই না থাকে, তাহার সবই যেন খোদার হইয়া যায়। পানাহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাপারে অন্য প্রাণীরা তাহার সহিত বড় রকমের অংশীদার। শিল্প কাজে কোন কোন প্রাণী তাহার চাইতে অনেক অগ্রসর। যেমন মধুমক্ষিকা প্রত্যেক ফুল হইতে সারসত্তা আহরণ করিয়া এমন সুন্দর মধু তৈরী করে যে, আজও মানুষ এই শিল্পে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐশী-মিলনের প্রেরণা, মানুষ ছাড়া অন্য

কোনও প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষের বড় সাফল্য হইল খোদা-মিলনে। তাহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, খোদার দিকে যেন তাহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়।

মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে লাভ করার উপায়

অবশ্য, যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, এই উদ্দেশ্য কেমন করিয়া কীভাবে অর্জন করা যায় এবং কী কী উপায়ে মানুষ ইহা পাইতে পারে, তবে জানা আবশ্যক যে, সর্বাপেক্ষা বড় উপায়, যাহা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির শর্ত, তাহা হইল খোদাতা'লাকে সঠিকরূপে চিনিতে হইবে এবং সত্য-খোদার উপর ঈমান আনিতে হইবে। কারণ যদি প্রথম পদক্ষেপেই ভুল হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি, দৃষ্টান্তস্থলে, কোন পক্ষী, ভূচর বা গ্রহ কিংবা কোন মানুষের সন্তানকে খোদা সাব্যস্ত করিয়া বসে, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপে যে সে সঠিক পথে চলিবে উহার আশা কোথায়? প্রকৃত খোদা তাঁহার অন্বেষণকারীদেরকে সাহায্য করেন। কিন্তু মৃত কী ভাবে মৃতকে সাহায্য করিবে? এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু অতি চমৎকার উপমা দিয়াছেন এবং তাহা এই ঃ

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا
كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

(সূরা রা'দ, 13 : 15)

অর্থাৎ, "প্রার্থনার উপযুক্ত প্রকৃত খোদা তিনি, যিনি সর্বশক্তিমান। যে সকল লোক তাঁহাকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে (উপাসনা করে), তাহারা ঐ সকল লোকদেরকে কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। তাহাদের দৃষ্টান্ত যেন কেহ পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলে ঃ পানি, আমার মুখে এস। ইহাতে কি পানি তাহার মুখে প্রবেশ করিবে? কখনও না। সুতরাং যাহারা প্রকৃত খোদা সম্পর্কে অনবহিত, তাহাদের সব দোয়া বিফল" (১৩ঃ১৫)।

দ্বিতীয় উপায় ঃ খোদাতা'লার সেই রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, যাহা গুণের চরমত্ব হিসাবে তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। কারণ, সৌন্দর্য

এমন এক জিনিস, যাহার দিকে হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং তদ্‌দর্শনে স্বভাবতই প্রেমের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ মহান পরাৎপর স্রষ্টার সৌন্দর্য হইতেছে তাঁহার একত্ব, গৌরব এবং গুণাবলী। যেমন, খোদাতা'লা কুরআনে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

(সূরা ইখলাস, 112 : 2-5)

অর্থাৎ, "খোদা তাঁহার সত্তা, গুণ ও মহিমায় এক অদ্বিতীয়। কেহ তাঁহার অংশীদার নহে। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে জীবন প্রাপ্ত হয়। তিনি সকল বস্তুর জন্য কল্যাণের উৎস এবং তিনি কাহারও কল্যাণে অভিষিক্ত নহেন। তিনি না কাহারও পুত্র, না কাহারও পিতা। তাহা সম্ভবই বা কীরূপে? কেননা, তাঁহার কোনও সম-সত্তা নাই" (১১২ঃ২-৫)। কুরআন বার বার খোদার কথা উপস্থিত করিয়া এবং তাঁহার গৌরব ও মহিমা প্রদর্শন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, দেখ! এহেন খোদাই হৃদয়ের প্রিয়তম হইতে পারেন। মৃত, কমজোর, কম দয়াবান বা কম শক্তি ও মহিমার অধিকারী কেহ হৃদয়ের কাম্য হইতে পারে না।

তৃতীয় উপায়, যাহা মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের সোপান, তাহা হইতেছে খোদাতা'লার অনুগ্রহের সহিত পরিচয়। কারণ, দুইটি জিনিস প্রেমের প্রেরণা দেয়, যথা-সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহ। খোদাতা'লার অনুগ্রহ প্রকাশক গুণাবলীর সার কথা সূরা ফাতিহায় বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, তিনি বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ

(সূরা ফাতিহা, 1 : 2-5)

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক; অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়; বিচার দিবসের মালিক।

কারণ, সুস্পষ্টতঃ পূর্ণ অনুগ্রহ ইহাতেই নিহিত যে, খোদাতা'লা তাঁহার বান্দাগণকে একেবারে অনস্তিত্ব হইতে সৃষ্টি করেন। অতঃপর সদা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে থাকেন এবং তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুর

আশ্রয়। তারপর, তাঁহার সর্বপ্রকার অনুগ্রহ তাঁহার বান্দাগণের জন্য প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার অনুগ্রহ সীমাহীন এবং অগণিত (১ঃ২-৪)। এই প্রকার অনুগ্রহের কথা খোদাতা'লা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যেমন, আরও এক স্থানে বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ (সূরা ইব্রাহীম, 14 : 35)

অর্থাৎ, "তোমরা খোদাতা'লার নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহিলে, কখনও তাহা পারিবে না" (১৪ঃ৩৫)।

চতুর্থ উপায় ঃ খোদাতা'লা মানুষের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'দোয়া'কেই নির্ধারিত করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেন ঃ

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ (সূরা মো'মিন, 40 : 61)

অর্থাৎ, "তোমরা দোয়া কর, আমি কবুল করিব" (৪০ঃ৬১)। তিনি বার বার দোয়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ আপন শক্তি দ্বারা নহে, বরং খোদাকে খোদার শক্তির দ্বারা লাভ করিতে পারে।

পঞ্চম উপায় ঃ জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য খোদাতা'লা মুজাহিদা (চেষ্টা-প্রচেষ্টা) নির্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, আপন ধন খোদার পথে ব্যয়ের দ্বারা, নিজ শক্তি খোদার পথে নিয়োগের দ্বারা, স্বীয় প্রাণ খোদার পথে উৎসর্গের দ্বারা এবং নিজ বুদ্ধি খোদার পথে পরিচালনার দ্বারা তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে। যেমন, তিনি বলেন ঃ

وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ (সূরা তওবা, 9 : 41)

وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۴﴾ (সূরা বাকারা, 2 : 4)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ (সূরা আনকবুত, 29 : 70)

অর্থাৎ, "তোমাদের ধন, তোমাদের প্রাণ এবং তোমাদের আত্মা উহার যাবতীয় শক্তিসহ খোদার পথে উৎসর্গ কর এবং যাহা কিছু আমরা বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার-শক্তি, নৈপুণ্য ইত্যাদি তোমাদিগকে দিয়াছি, তৎসমুদয়ই খোদার পথে নিয়োগ কর। যাহারা আমাদের পথে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে,

আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথসমূহ দেখাইয়া থাকি (৯ঃ৪১, ২ঃ৪, ২৯ঃ৭০)"।

ষষ্ঠ উপায় ঃ জীবনের মুল উদ্দেশ্য লাভের জন্য এস্তেকামতের (ধৈর্য ও স্থৈর্য) উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই পথে শ্রান্ত, অক্ষম ও ক্লান্ত হইবে না এবং পরীক্ষাকে ভয় করিবে না। যেমন, আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ (সূরা ফুস্সিলাত, 41 : 31-32)

অর্থাৎ, 'যাহারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্ এবং সব মিথ্যা খোদা হইতে পৃথক হইয়া এস্তেকামত অবলম্বন করে, অর্থাৎ নানা প্রকার পরীক্ষায় ও বিপদে অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় (এই বাণী লইয়া) যে, 'তোমরা ভয় করিবে না এবং চিন্তাযুক্ত হইবে না বরং আনন্দে উৎফুল্ল হও যে, তোমরা সেই খুশীর উত্তরাধিকারী হইয়াছ, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা ইহকালের জীবনে এবং পরলোকেও তোমাদের বন্ধু" (৪১ঃ৩১-৩২)। এখানে এই কথাগুলিতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, এস্তেকামতের দ্বারা খোদার সন্তুষ্টি লাভ হয়। সত্য কথা, **কারামত (অলৌকিক শক্তি) হইতে এস্তেকামত বড়**। পূর্ণ এস্তেকামত এই যে, চতুর্দিক হইতে বিপদ-আপদে অভিভূত হইয়া এবং খোদার পথে ধন, প্রাণ ও মান-সম্ভ্রমকে বিপদগ্রস্ত পাইয়া, সান্ত্বনার কোন কোন কিছু না দেখিয়া; এমন কি, খোদাতা'লার পক্ষ হইতে সান্ত্বনাদানকারী কাশ্ফ, স্বপ্ন ও এলহাম-প্রাপ্তি পরীক্ষাস্বরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভীষণ ভয়ের অবস্থায় পড়িয়াও কাপুরুষতা দেখাইবে না; ভীরু লোকের ন্যায় পিছনে হটিবে না এবং বিশ্বস্ততার মধ্যে কোন ত্রুটি ঘটিতে দিবে না। সত্যতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যে কোন বিচ্যুতির স্পর্শও লাগিতে দিবে না; অবমাননায় আনন্দিত হইবে, মৃত্যুতে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কোন বন্ধুর অপেক্ষা করিবে না যে, সে সাহায্য করিবে। তখন খোদার নিকট সুসংবাদও চাহিবে না যে, সময় সংকটাপন্ন হইয়াছে।

সম্পূর্ণ একাকী, দুর্বল অবস্থায় সান্ত্বনা না পাওয়া সত্ত্বেও খাড়া থাকিবে। যাহা হওয়ার হউক বলিয়া ঘাড় সম্মুখে পাতিয়া দিবে। ঐশী বিচার ও মীমাংসায় কোন আক্ষেপ করিবে না। কখনও অস্থিরতা প্রদর্শন এবং হা-হুতাশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার দাবী সমাপ্ত হয়।

ইহাই এস্তেকামত যদ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়। ইহাই সেই জিনিস, যাহার সৌরভ রসূল, নবী, সিদ্দীক এবং শহীদানের মৃত্তিকা হইতে এখনও আসিতেছে। ইহারই দিকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এই দোয়ায় ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

(সূরা ফাতেহা, 1 : 6-7)

অর্থাৎ, "হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে এস্তেকামতের (অবিচলতা বা দৃঢ়তার) পথ দেখাও। সেই পথ, যে পথে তোমার পুরস্কার ও অনুগ্রহ বিতরণ করা হয় এবং তুমি সন্তুষ্ট হও" (১ঃ৬-৭)।

ইহারই দিকে আরও এক আয়াতে এই ইঙ্গিত করেন ঃ

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۚ (সূরা আ'রাফ, 7 : 127)

"প্রভু, এই বিপদে আমাদের হৃদয়ে সেই প্রশান্তি অবতীর্ণ কর, যাহার ফলে ধৈর্য জন্মে এবং এমন কর, যেমন আমাদের মৃত্যু ইসলামের উপর হয়" (৭ঃ১২৭)। জানা প্রয়োজন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের হৃদয়ে এক আলোক অবতীর্ণ করেন, যদ্বারা তাহারা শক্তি লাভ করিয়া অত্যন্ত শান্তভাবে বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তাঁহার পথে তাহাদের পায়ে যে সকল শিকল জড়াইয়া গিয়াছিল, ঈমানের সুধায় উহাদেরকে তাহারা চুম্বন দেয়। যখন খোদাপ্রাপ্ত মানুষের উপর বিপদাবলী অবতীর্ণ হয় এবং মৃত্যুর লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়, তখন সে আপন দয়াময় প্রভুর সহিত অনাবশ্যক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রার্থনা করে না যে, তাহাকে এই বিপদ হইতে বাঁচান হউক। কারণ, তখন নিরাপত্তার জন্য দোয়ায় জোর দেওয়া খোদাতা'লার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং ঐকান্তিকতার বিরুদ্ধাচরণ করার নামান্তর। বরং সত্যিকার প্রেমিক বিপদ অবতীর্ণ হইলে, আরও সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং এহেন সময়ে প্রাণকে

তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং প্রাণের মায়াকে বিদায় দিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি ভিক্ষা করে। ইহারই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

(সূরা বাকারা, 2 : 208)

অর্থাৎ, "খোদার প্রিয় বান্দা তাহার প্রাণ খোদার পথে বিক্রয় করে এবং উহার পরিবর্তে খোদাতা'লার সন্তুষ্টি ক্রয় করে। ইহারাই বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র" (২ঃ২০৮)। বস্তুতঃ যে এস্তেকামত দ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়, উহার প্রাণ ইহাই, যাহা বর্ণিত হইল। যে বুঝিতে চাহে, বুঝিয়া লউক।

সপ্তম উপায় ঃ জীবনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধু-সঙ্গ এবং তাঁহাদের পূর্ণ নমুনা দর্শন করা আবশ্যক। সুতরাং নবীগণের প্রয়োজনীয়তার মধ্য হইতে এক প্রয়োজন ইহাই যে, মানুষ স্বভাবতঃ পূর্ণ আদর্শের মুখাপেক্ষী। মানুষ নবীদের মধ্যে সেই আদর্শ দেখিতে পায় ও অনুসরণের সুযোগ পায়। পূর্ণ আদর্শ আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সাহস বাড়ায়। যে আদর্শের অনুবর্তী হয় না, সে শিথিল এবং পথভ্রষ্ট হয়। ইহার প্রতি আল্লাহতা'লা এই আয়াতে সংকেত দিয়াছেন ঃ

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○ (সূরা তওবা, 9 : 119)

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ (সূরা ফাতেহা, 1 : 7)

অর্থাৎ, "তোমরা তাহাদের সঙ্গ অবলম্বন কর, যাহারা সাধু" (৯ঃ১১৯)। তাহাদের চলার পথ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহাদের উপরে তোমাদের পূর্বে অনুগ্রহ করা হইয়াছে" (১ঃ৭)।

অষ্টম উপায় ঃ খোদাতা'লার তরফ হইতে কাশ্‌ফ (জাগ্রত অবস্থায় দিব্যদর্শন), পবিত্র এলহাম এবং সত্য-স্বপ্ন লাভ। যেহেতু খোদাতা'লার দিকে যাত্রা করিতে একান্ত সূক্ষাতি-সূক্ষ পথে চলিতে হয় এবং তৎসঙ্গে নানা প্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ লাগিয়াই থাকে এবং ইহাও সম্ভবপর যে, মানুষ এই অপরিচিত পথে চলিতে ভুল করে বা নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে

ঘিরিয়া ফেলে এবং সে সম্মুখে চলা ছাড়িয়া দেয়,সেহেতু খোদাতা'লা আপন করুণায় চাহেন যে, তিনি এই যাত্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া যান এবং তাহার মনোরঞ্জন করেন, এবং তাহার সাহস ও মনোবলের মেরুদন্ডকে সোজা ও দৃঢ় রাখেন যেন তাহার আগ্রহ বর্ধিত হয়। সুতরাং তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম এই পথের পথিকগণের সহিত ইহাই যে, তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার কথা ও এলহাম (ঐশী বাণী) দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেন এবং তাহাদের নিকট প্রমাণ করেন যে, তিনি তাহাদের সঙ্গে আছেন। তখন তাহারা শক্তি লাভ করিয়া মহা তেজে এই পথ অতিক্রম করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে, এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ (সূরা ইউনুস, 10 : 65)

"তাহাদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে সুসংবাদ (১০ঃ৬৫)।"

এই প্রকারের আরও অনেক উপায় আছে, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রসঙ্গ দীর্ঘ হওয়ার আশংকায়, আমরা তাহা লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেছি না।

চতুর্থ প্রশ্ন

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কর্মের অর্থাৎ ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা শরীয়ত পালনের ফলাফল কী?

এই প্রশ্নের উত্তর উহাই, যাহা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করিয়াছি। খোদার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ শরীয়তের যে ক্রিয়া ইহলোকে মানব হৃদয়ের উপর হয়, তাহা এই যে, উহা তাহাকে বন্য বর্বর অবস্থা হইতে মানুষ করে। তারপর মানুষ হইতে তাহাকে চরিত্রবান মানুষে উন্নীত করে। তারপর চরিত্রবান মানুষ হইতে তাহাকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে পরিণত করে। তদুপরি, এই জীবনে সঠিক শরীয়তের বিধান ব্যবহারিক জীবনে পালনের একটি ফল এই হয় যে, প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের প্রভাবে মানব জাতি ক্রমে ক্রমে তাহাদের অধিকারসমূহ বুঝিতে পারে এবং ন্যায়পরায়ণতা, দয়া এবং সহানুভূতির বৃত্তিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহারে তৎপর হয়। খোদা তাহাকে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাহা কিছু দিয়াছেন, তিনি সব মানুষকে তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী ঐ সকল নেয়ামত বিতরণ করেন। এহেন মানুষ সমগ্র মানব জাতির উপর সূর্যের ন্যায় স্বীয় আলোক বিস্তার করেন এবং চাঁদের ন্যায় পরমাত্মা হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া সেই আলো অন্যদের নিকট পৌঁছান। এহেন মানুষ দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া সাধুতার ও কল্যাণের পথ লোকদিগকে প্রদর্শন করেন। এহেন মানুষ রাত্রির ন্যায় প্রত্যেক দুর্বলের লজ্জা আবৃত করেন। তিনি ক্লান্ত ও শ্রান্তদিগকে আরাম পৌঁছান। তিনি আকাশের ন্যায় প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তিকে আপন ছায়ার নীচে স্থান দেন এবং যথাসময়ে আপন অনুগ্রহ-বারি বর্ষণ করেন। তিনি মাটির ন্যায় চরম বিনয়ী হইয়া প্রত্যেকের আরামের জন্য বিছানার মত হইয়া যান এবং সকলকেই তাঁহার সৌজন্যের আঁচলে গ্রহণ করেন এবং নানা প্রকার আধ্যাত্মিক ফল তাহাদের জন্য পেশ করেন। সুতরাং ইহাই পরিপূর্ণ শরীয়তের প্রভাব। পরিপূর্ণ শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ আল্লাহ্‌র হক্ এবং বান্দার হক্ পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে, খোদার মধ্যে বিলীন হয় এবং সৃষ্টির সত্যিকার সেবক হইয়া যায়। ইহজীবনের উপর ইহাই

শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিপালনের ক্রিয়া। ইহলৌকিক জীবনের পর ইহার যে ক্রিয়া, তাহা হইল সেই দিন খোদার আধ্যাত্মিক মিলন প্রকাশ্য সাক্ষাতের ও নৈকট্যের আকারে তাহার গোচরীভূত হইবে। ঈমান ও আমল সালেহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সে খোদার প্রেমে সৃষ্ট জীবের যে সেবা করিয়াছিল তাহা বেহেশ্‌তের বৃক্ষরাজি ও নদ-নদীসমূহে রূপায়িত হইয়া দেখা দিবে। এ সম্পর্কে খোদাতা'লার বাণী এই ঃ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا
فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ كَذَّبَتْ
ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۝ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝
فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۝ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

(সূরা শাম্‌স, 91 : 2-16)

অর্থাৎ, "কসম সূর্যের এবং উহার কিরণের; এবং কসম চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের অনুগমন করে, অর্থাৎ সূর্য হইতে আলোক গ্রহণ করে, অতঃপর সূর্যের ন্যায় অন্যদের নিকট আলোক পৌঁছায়; এবং কসম দিনের, যখন উহা সূর্যের উজ্জ্বলতাকে দেখায় এবং পথ-ঘাটকে স্পষ্ট করিয়া দেয়; এবং কসম রাত্রির, যখন উহা অন্ধকার করে এবং সকলকে নিজ অন্ধকারের আঁচলে ঢাকিয়া লয় এবং কসম আকাশের এবং সেই মুখ্য কারণের, যে জন্য ইহার সৃষ্টি; এবং কসম পৃথিবীর এবং সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের, যে জন্য যমীন এই প্রকার বিছানা হিসাবে গঠিত হইয়াছে; এবং কসম আত্মার এবং আত্মার ঐ সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর, যাহা ইহাকে সকল বস্তুর সহিত সমান করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, ঐ সব উৎকর্ষতা, যাহা বিভিন্ন আকারে ঐ সব জিনিষের মধ্যে পাওয়া যায়, পরিপূর্ণ মানুষের আত্মা সেই সব কিছুই একভাবে নিজের মধ্যে ধারণ করে; এবং ঐ সকল জিনিস পৃথক পৃথকভাবে যেরূপ মানব জাতির খেদমত করিতেছে,

পরিপূর্ণ মানুষ এই সব সেবা একা করিতেছে, যেরূপ আমি এখনই লিখিয়া আসিয়াছি। তারপর বলেন, সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, যে এই প্রকারে নিজ আত্মাকে শুদ্ধ করিয়াছে। অর্থাৎ খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া সে সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় খোদার সৃষ্টির সেবক হইয়াছে" (৯১ঃ২-১৬)। স্মরণ রাখিও যে, জীবন বলিতে অনন্ত জীবনকে বুঝায় যাহা ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ মানুষ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, ব্যবহারিক শরীয়তের ফল পরলোকে অনন্ত জীবন লাভ, যাহা খোদার নৈকট্যের খাদ্যে সর্বদা কায়েম থাকিবে।

অতঃপর বলেন ঃ "সেই মানুষ ধ্বংস হইয়াছে এবং জীবনে নিরাশ হইয়াছে, যে তাহার আত্মাকে মাটিতে মিশাইয়াছে"। যে সকল উৎকর্ষতা অর্জনের যোগ্যতা তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, সে ঐ সকল উৎকর্ষতা লাভ করে নাই এবং পচা-গলিত জীবন যাপন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

তারপর দৃষ্টান্তস্থলে বলেন, "সেই দুর্ভাগার কাহিনী, সামূদের কাহিনীর অনুরূপ, যাহারা সেই উস্ট্রীকে আহত করিয়াছিল, যাহা খোদার উস্ট্রী বলিয়া কথিত হইত এবং তাহার জন্য নির্দিষ্ট প্রস্রবণ হইতে পানি পান করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেরূপ ঐ ব্যক্তিও প্রকৃতই খোদার উস্ট্রীকে আহত করিয়াছে এবং উহাকে উহার প্রস্রবণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল"। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, মানুষের আত্মা খোদার উস্ট্রী, যাহার উপর তিনি আরোহণ করেন। অর্থাৎ, মানুষের হৃদয় ঐশী জ্যোতির্বিকাশের স্থান এবং এই উস্ট্রীর পানি ঐশীপ্রেম ও জ্ঞান, যদ্বারা উহা জীবিত থাকে। তারপর বলেন ঃ "সামূদ জাতি যখন উস্ট্রীকে আহত করিল এবং উহাকে পানি হইতে বঞ্চিত করিল, তখন তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইল এবং খোদাতা'লা এ কথার কোনই পরওয়া করিলেন না যে, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের সন্তানগণের এবং বিধবাগণের কী অবস্থা হইবে"। সুতরাং অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঐ উস্ট্রী, অর্থাৎ, আত্মাকে আহত করে এবং উহাকে উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছাইতে চাহে না এবং উহার পানি পান রোধ করে, সে-ও ধ্বংস হইবে।

কুরআন শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন বস্তুর কসম (দিব্য) তত্ত্ব

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদা কর্তৃক সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির কসম করার মধ্যে এক গভীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব নিহিত আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীরা অজ্ঞতাবশতঃ আপত্তি উত্থাপন করে যে, খোদার কসমের কী প্রয়োজন ছিল? তিনি সৃষ্টির কসম করিলেন কেন? কিন্তু যেহেতু তাহাদের বুদ্ধি পার্থিব, ঐশী নহে, সেই জন্য তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। অতএব জানা আবশ্যক, কসম করিবার মূল উদ্দেশ্য হইল কসমকারী তাহার দাবীর সমর্থনে এক সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে। কারণ, যে ব্যক্তির দাবীর অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, সে সাক্ষীর পরিবর্তে খোদাতা'লার কসম এজন্য করে যে, খোদা হইলেন 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা) এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় তিনিই প্রথম সাক্ষী। অন্য কথায়, সে খোদার সাক্ষ্য এই জন্য উপস্থিত করে যে, এই কসমের পর খোদাতা'লা চুপ থাকিলে এবং তাহার উপর শাস্তি অবতীর্ণ না করিলে, প্রকারান্তরে তিনি ঐ ব্যক্তির বিবৃতিকে সাক্ষীদের ন্যায় সমর্থন করিলেন। সেই জন্য কোন সৃষ্টের জন্য অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর কসম খাওয়া উচিত নহে। কারণ কোন প্রাণীই আলেমুল গায়েব নহে এবং মিথ্যা কসম করায় শাস্তি দিতেও সে পারে না। কিন্তু আলোচনাধীন আয়াতগুলিতে খোদার কসম করা মানুষের কসমের মত নহে। বরং উহার দ্বারা খোদাতা'লার বিধানের দুই প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে ঃ- এক, প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহা সকলেই বুঝিতে পারে এবং যাহাতে কাহারও মতবিরোধ নাই। দ্বিতীয়, ঐ ক্রিয়া, যাহা প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ যাহা যুক্তি প্রয়োগে বোধগম্য হয়। এই ক্ষেত্রে মানুষ ভুল করে এবং পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্যও হয়। সুতরাং খোদাতা'লা তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া উহার মাধ্যমে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াকে মানুষের নিকট প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

বস্তুতঃ, ইহা সুস্পষ্ট যে, সূর্য, চন্দ্র, দিবা, রাত্রি, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যাহার বর্ণনা আমরা করিয়া আসিলাম। কিন্তু ঐ সকল বৈশিষ্ট্য যে বিবেকবান মানুষের আত্মায়ও

প্রচ্ছন্ন আছে, সে সম্বন্ধে সকলে অবগত নহে। সুতরাং খোদাতা'লা তাঁহার প্রচ্ছন্ন কার্যাবলীকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্যাবলীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করিয়াছেন। অন্য কথায়, তিনি বলেন ঃ যদি তাহাদের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, যাহা বিবেকবান মানুষের আত্মায়ও পাওয়া যায়, তবে চন্দ্র, সূর্য, প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা কর। উহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান এবং তোমরা ইহাও জান যে, মানুষ এক ক্ষুদ্র জগৎ। তাহার আত্মায় সমগ্র জগতের নকশা সমষ্টিগতভাবে নিহিত। অতএব, যখন ইহা প্রমাণিত হয় যে, মহা জগতের প্রধান প্রধান সত্তাগুলিতে ঐ সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে এবং এই প্রকারে সৃষ্ট জীবের নিকট কল্যাণ পৌঁছাইতেছে, তখন উহাদের সকলের চাইতে বড় বলিয়া কথিত এবং উচ্চ পর্যায়ের সৃষ্ট মানুষ কেন ঐ সব বৈশিষ্ট্য হইতে রিক্ত ও বঞ্চিত থাকিবে? কখনও নহে। বরং তাহার মধ্যে সূর্যের ন্যায় জ্ঞান ও যুক্তির আলোক আছে, যদ্বারা সে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিতে পারে; এবং চন্দ্রের ন্যায় সে পরাৎপর স্রষ্টা হইতে কাশ্‌ফ, এলহাম ও ওহীর আলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্যদের নিকট পর্যন্ত সেই আলোক পৌঁছাইতে পারে, যাহারা এখন পর্যন্ত মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর কীরূপে বলিতে পার যে, নবুয়ত অসত্য এবং রেসালত, শরীয়ত এবং ঐশীগ্রন্থ মানুষের প্রতারণা ও স্বার্থপরতাপ্রসূত? আরও দেখ, কি প্রকারে দিবালোকে সব রাস্তাঘাট উজ্জ্বল হয়। উঁচু নিচু সব দেখা যায়। এইভাবে কামেল ইনসান (পরিপূর্ণ মানব) আধ্যাত্মিক জ্যোতির দিবসস্বরূপ। তাহার আগমনে সব পথ-ঘাট দৃশ্যমান হয়। কোথায় কোন্‌দিকে সত্য পথ তাহা তিনি দেখাইয়া দেন। কারণ তিনিই সত্য ও সত্যবাদিতার দিবালোক। তারপর, ইহাও দেখিতে পাও যে, রাত্রি কি প্রকারে ক্লান্ত-শ্রান্তকে আশ্রয় দেয়। সারাদিনের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মজুর রাত্রির স্নেহ-অঙ্কে সুখে ঘুমায় এবং পরিশ্রম হইতে আরাম পায়। রাত্রি প্রত্যেকের জন্য আবরণস্বরূপ। সেইরূপ, খোদার কামেল বান্দাগণ বিশ্ববাসীকে আরাম দেওয়ার জন্য আসেন। তাঁহারা খোদা হইতে ওহী এলহাম পাইয়া বুদ্ধিমানদিগকে প্রাণান্তকর ক্লেশ হইতে আরাম দেন। তাঁহাদের কল্যাণে বড় বড় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্যের সমাধান সহজে হয়। সেইভাবে, খোদার

ওহী, মানুষের যুক্তির ত্রুটিকে ঢাকিয়া দেয়, যেমন রাত্রি সকল বস্তুর উপর স্বীয় আঁধার-আবরণ টানিয়া দিয়া উহার অপবিত্র দোষ-ত্রুটি জগতের নিকট প্রকাশিত হইতে দেয় না। কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ওহীর আলোক প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের অভ্যন্তরস্থ ভ্রান্তির সংশোধন করে এবং খোদার পবিত্র এলহামের বরকতে নিজদিগকে নগ্নতা হইতে রক্ষা করে। এই কারণে ইসলামের কোন দার্শনিক প্লেটোর ন্যায় কোন প্রতিমার সমক্ষে মোরগ বলি দেয় নাই। প্লেটো এলহামের আলোক হইতে বঞ্চিত ছিল এজন্য সে বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল। সে বড় দার্শনিক বলিয়া অভিহিত হইয়াও বোকার মত এই ঘৃণিত কার্যটি করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের দার্শণিকগণকে এমন অপবিত্র ও নির্বোধকান্ড হইতে আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা রক্ষা করিয়াছে। এখন দেখ, এলহাম কি প্রকারে রাত্রির ন্যায় বুদ্ধিমানগণের ত্রুটি ঢাকিয়া দেয়।

আপনারা ইহাও জানেন যে, খোদার কামেল বান্দাগণ সুবিশাল আকাশের ন্যায়, প্রত্যেক তাপ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ছায়া দান করে। বিশেষতঃ সেই মহামহিম স্রষ্টার নবীগণ ও এলহামপ্রাপ্তগণ সাধারণতঃ আকাশের ন্যায় কল্যাণ বর্ষণ করেন। তেমনইভাবে ভূমির স্বভাবও তাঁহাদের মধ্যে থাকে। তাঁহাদের পরম পবিত্র আত্মা হইতে নানা প্রকার উচ্চমার্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃক্ষ জন্মায়। সেগুলির ছায়া ও ফুল-ফল দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। সুতরাং, আমাদের সম্মুখস্থ এই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক বিধান সেই প্রচ্ছন্ন বিধানের এক সাক্ষী, যাহার সাক্ষ্য কসমের আকারে খোদাতা'লা উল্লিখিত আয়াতগুলিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং, দেখ ইহা কেমন জ্ঞানগর্ভ বাক্য, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায়। ইহা তাঁহারই মুখ হইতে নিঃসৃত, যিনি এক নিরক্ষর মরুবাসী (সা.) ছিলেন। ইহা খোদার (কথা) না হইলে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিগণ ইহার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ইহাকে এভাবে আপত্তির আকারে দেখিত না। ইহা নিয়মের কথা যে, মানুষ যখন কোন কথা কোন দিক দিয়া তাহার সীমিত বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে অক্ষম হয়, তখন সে এক জ্ঞানপূর্ণ কথাকে আপত্তিকর মনে করে। তাহার আপত্তি একথার সাক্ষী হয় যে,

সেই সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য অনেক উর্দ্ধের বিষয়। সেই জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইয়াও উহার বিরুদ্ধে আপত্তি করে। কিন্তু এখন, এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর আশা করা যায়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি না করিয়া বরং ইহা গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, কুরআন শরীফ ওহী এলহামের চিরাচরিত নিয়মের প্রাকৃতিক বিধান হইতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আরও এক স্থানে এক প্রকারের কসমের ব্যবহার করিয়াছে। তাহা এই ঃ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

(সূরা তারিক্ব, 86 : 12-15)

অর্থাৎ, "সেই আকাশের কসম, যেখান হইতে বৃষ্টি পড়ে এবং সেই পৃথিবীর কসম, যাহা বৃষ্টির ফলে নানা প্রকার সবুজ বৃক্ষলতা ও শস্য জন্মায়। এই কুরআন খোদার কথা এবং তাঁহার ওহী। ইহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী। ইহা নিরর্থক বা বৃথা নহে" (৮৬ঃ১২-১৫)। অর্থাৎ, ইহা অসময়ে আসে নাই। মৌসুমের বৃষ্টির ন্যায় উহা যথা সময়ে আগমন করিয়াছে।

এখন খোদাতা'লা কুরআন শরীফের সত্যতা প্রমাণার্থে, যাহা তাঁহার ওহী, একটি প্রকাশ্য প্রাকৃতিক বিধানকে কসমের রঙে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিধানে সর্বদা দেখা যায় যে, প্রয়োজনের সময় আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হয়। পৃথিবীর শস্যশ্যামলতা আকাশের এই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যদি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত না হয়, তবে, ক্রমে ক্রমে কূপও শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর পানির সত্তা ও স্থিতি আকাশের পানির উপর নির্ভর করে। এই কারণে যখনই বৃষ্টিপাত হয়, তখনই কূপের পানিও উপরে উঠে। কেন উঠে? ইহার কারণ এই যে, আকাশের পানি পৃথিবীর পানিকে উপরের দিকে আকর্ষণ করে। এই সম্পর্কই আল্লাহ্‌র ওহী ও মানুষের বুদ্ধির মধ্যে বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র ওহী অর্থাৎ এলহামে ইলাহী আকাশের পানিস্বরূপ এবং মানুষের বুদ্ধি হইতেছে পৃথিবীর পানি যাহা সর্বদা আকাশের পানি অর্থাৎ এলহাম

দ্বারা প্রতিপালিত হয়। যদি আকাশের বৃষ্টি অর্থাৎ ওহীর ধারা বন্ধ হইয়া যায়, তবে পৃথিবীর পানিও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়ে। ইহার জন্য কি এই প্রমাণই যথেষ্ট নহে যে, যদি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যায় এবং কোন এলহাম লাভকারী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি অত্যন্ত ময়লাযুক্ত ও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শুষ্ক হয় ও পচিয়া যায়। ইহা বুঝিবার জন্য ঐ যুগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট যে, আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আসিবার পূর্বে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল? তখন হযরত মসীহের সময়ের পর প্রায় ছয়শত বৎসর পার হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে কোন এলহাম লাভকারী জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এজন্য সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস এখন উচ্চ কণ্ঠে একথা ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে এবং তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে, সমগ্র পৃথিবীতে বিকৃত ভাবধারা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমন কেন হইয়াছিল? ইহার কারণ কী ছিল? উহা এই যে, এলহামের ধারা বহু যুগ ধরিয়া বন্ধ ছিল। স্বর্গীয় সাম্রাজ্য তখন শুধু বুদ্ধির হাতে ছিল। সুতরাং, অপরিণত বুদ্ধি কত না পাপ ও দোষের মধ্যেই মানুষকে নিপতিত করিল। এই সম্বন্ধে অবগত নহে এমন কেহ আছে কি? দেখ, এলহামের পানি যখন দীর্ঘকাল জগতে বর্ষিল না, তখন সব বুদ্ধির পানি কীভাবে শুষ্ক হইয়া গেল।

সুতরাং, এই সব কসমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রাকৃতিক বিধানকে পেশ করেন এবং বলেন যে, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, ইহা কি খোদার অমোঘ চিরন্তন প্রাকৃতিক বিধান নহে যে, আকাশের পানির উপরেই পৃথিবীর যাবতীয় শস্য ও শ্যামলতা নির্ভর করে? সুতরাং এই সুস্পষ্ট দৃশ্যমান প্রাকৃতিক বিধান ইলাহী এলহামের গুপ্ত প্রাকৃতিক বিধানের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ। অতএব এই সাক্ষ্যের দ্বারা উপকৃত হও। শুধু বুদ্ধিকে আপন পথ-প্রদর্শক করিও না। উহা এমন পানি নহে যে, আকাশের পানি ছাড়া বিদ্যমান থাকিতে পারে। আকাশের পানির বিশেষত্ব এই যে, কোন কূপে ঐ পানি পতিত হউক বা না হউক, উহা তাহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ সব কূপের পানিকে উর্দ্ধে উঠায়। তেমনই যখন খোদার

কোন এলহাম লাভকারী পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাঁহার অনুসরণ করুক বা না করুক, সেই এলহাম লাভকারীর যুগে সব বুদ্ধির মধ্যে স্বতই এমন আলোক ও স্বচ্ছতা উপস্থিত হয়, যাহা ইতিপূর্বে ছিল না। মানুষ তখন নিজে নিজে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং অদৃশ্য হইতে তাহাদের চিন্তা শক্তির মধ্যে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বুদ্ধি ও যুক্তির এইসব উন্নতি ও আন্তরিক উৎসাহ উদ্দীপনা সমাগত এলহাম লাভকারীর শুভ পদার্পণে সৃষ্টি হয় এবং ভু-গর্ভস্থ সব পানিই উপরে উঠানো হয়। যখন তোমরা দেখিতে পাও যে, ধর্মানুসন্ধানে সকলেই দন্ডায়মান হইয়াছে এবং পৃথিবীর পানিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে, তখন উঠ, সতর্ক হও। নিশ্চিত জানিও যে, আকাশ হইতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কোনো হৃদয়ে এলহামের বর্ষণ হইয়াছে।

পঞ্চম প্রশ্ন

মা'রেফতে এলাহী (ঐশীজ্ঞান) লাভের উপায়

এ সম্বন্ধে কুরআন শরীফে অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে। তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য এখানে কিছুতেই স্থান সংকুলান হইবে না। নমুনাস্বরূপ কিছু বলা হইতেছে মাত্র। জানা আবশ্যক, কুরআন শরীফ জ্ঞানকে তিন প্রকারের বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে ঃ (১) 'ইল্‌মুল একীন' (যৌক্তিক জ্ঞান) (২) 'আইনুল একীন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) (৩) 'হাক্‌কুল একীন' (অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত জ্ঞান)। ইতিপূর্বে, সূরা আল্ হাকুমুত্‌তাকাসুর-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইলমুল একীন হইল, কোন মধ্যবর্তীর সাহায্যে, বিনা মধ্যবর্তিতায় নহে, অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান লাভ। যেমন, আমরা ধুম্র হইতে অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণ করি। আমরা বলি, অগ্নি দেখি নাই, কিন্তু ধুঁয়া দেখিয়াছি এবং ইহাতে অগ্নি বিদ্যমান থাকার প্রত্যয় জন্মিয়াছে। সুতরাং ইহা 'ইলমুল একীন'। যদি আমরা অগ্নি দেখিতে পাই, তবে কুরআন শরীফের আল্ হাকুমুত্‌তাকাসুর সূরাতে বর্ণিত জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগে ইহার নাম আইনুল একীন। যদি আমরা এই অগ্নিতে প্রবেশ করি, তবে এই পর্যায়ের জ্ঞানের নাম কুরআন শরীফের বর্ণনানুসারে

হইবে 'হাক্কুল একীন'। সূরা আল্ হাকুমুত্তাকাসুর পুনরায় এখানে লেখা অনাবশ্যক। পাঠক যথাস্থানে উহা দেখিয়া লউন।

এখন জানা কর্তব্য, প্রথম প্রকারের যে জ্ঞান, অর্থাৎ ইল্মুল একীন, উহা লাভ করিবার উপায় যুক্তি এবং তথ্য। আল্লাহ্তা'লা দোযখীদের কথা তাহাদের মুখ দিয়াই বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ (সূরা মুল্ক, 67 : 11)

অর্থাৎ, "দোযখীরা বলিবেঃ যদি আমরা বুদ্ধিমান হইতাম এবং ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিতাম কিংবা পূর্ণ জ্ঞানী গবেষকগণের লেখা ও বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনিতাম, তবে আজ আমরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইতাম না (৬৭ঃ১১)।" এই আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতের সমর্থক। ইহাতে আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ (সূরা বাকারা, 2 : 287)

অর্থাৎ, "খোদাতা'লা মানুষের আত্মাকে উহার জ্ঞানের অধিক কোন কথা স্বীকার করিবার জন্য কষ্ট দেন না" (২ঃ২৮৭)। বরং তিনি সেই ধর্মবিশ্বাসই উপস্থাপিত করেন, যাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে, যাহাতে তাঁহার আদেশ পালন সাধ্যের অতীত না হইয়া পড়ে। এই আয়াতগুলিতে এই ইশারাও রহিয়াছে যে, মানুষ কর্ণের দ্বারাও এল্মুল একীন লাভ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন আমরা লন্ডন দেখি নাই, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই শহর থাকার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা এই সন্দেহ করিতে পারি যে, হয়তো তাহারা সকলেই মিথ্যা বলিয়াছে? আমরা আলমগীর বাদশাহের আমল পাই নাই। আলমগীরের চেহারাও আমরা দেখি নাই, কিন্তু আলমগীর যে চুঘতাই বাদশাগণের অন্যতম, ইহাতে কি আমাদের কোন সন্দেহ আছে? এই প্রকার একীন বা প্রত্যয় কীরূপে জন্মিল? ইহার উত্তর এই যে, শুধু ধারাবাহিক শ্রুতির দ্বারা। সুতরাং, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, শ্রুতিও 'এলমুল একীনের' পর্যায়ে পৌঁছায়। নবীগণের কেতাব, যদি শ্রুতির ধারাবাহিকতায় কোন দোষ না থাকে, তবে তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ জ্ঞানের উপায়। কিন্তু কোন গ্রন্থ ঐশী গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইলেও যদি উহার পঞ্চাশ কি ষাট কপি পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, ইহার একটা অন্যটার

বিরোধী এবং কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে, ইহাদের মধ্যে শুধু দুই চারটি কপি বিশুদ্ধ আর অন্যগুলি জাল বা প্রক্ষিপ্ত, তাহা হইলে গবেষকের নিকট এই ধরনের বিশ্বাস, যাহা সত্যিকারের গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কোন কাজের বলিয়া গণ্য হইবে না। ফলে ঐ সবগুলি পুস্তকই পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। আর কখনও এই প্রকার পরস্পর বিরোধী বিবরণ কোন জ্ঞানের বাহক বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ জ্ঞানের সংজ্ঞা ইহাই যে, এক নিশ্চিত তত্ত্বের সহিত পরিচয় করান। বৈপরীত্যের স্তুপ হইতে নিশ্চিত তত্ত্ব লাভ সম্ভব নহে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফ শুধু শ্রুতির সীমা পর্যন্ত আবদ্ধ নহে। কারণ ইহা মানুষকে বুঝানোর জন্য বড়ই যুক্তি প্রমাণে পরিপূর্ণ। যেসব ধর্ম-বিশ্বাস, মূলনীতি এবং আদেশ-নিষেধ ইহা পেশ করে, ঐগুলির মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা যুক্তিহীন, যাহা বল প্রয়োগের উপর স্থাপিত। কুরআন নিজেই বলে যে, ইহার প্রদত্ত সকল ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিতে পূর্ব হইতে অঙ্কিত রহিয়াছে। কুরআন শরীফের নাম এই জন্যই যিক্‌র (স্মরণিকা)।
যেমন, বলা হয়েছে ঃ

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ (সূরা আম্বিয়া, 21 : 51)

অর্থাৎ, "এই কুরআন পরম আশিসমন্ডিত স্মরণিকা" (২১ঃ৫১)। ইহা কোন নতুন জিনিস আনে নাই। বরং মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতির পুস্তক যদ্বারা ভরপুর, উহা তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এক স্থানে বলা হইয়াছেঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (সূরা বাকারা, 2 : 257)

অর্থাৎ, "এই ধর্ম বল প্রয়োগের দ্বারা কিছু স্বীকার করাইতে চাহে না, বরং প্রত্যেক বিষয়েই যুক্তি পেশ করে (২ঃ২৫৭)।" এতদ্ব্যতীত কুরআনে হৃদয়কে আলোকিত করিবার জন্য এক আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, খোদাতা'লা বলেন ঃ

شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ (সূরা ইউনুস, 10 : 58)

অর্থাৎ, "কুরআন ইহার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সর্ব প্রকারের হৃদ-ব্যাধি বা মনের রোগ নিরাময় করে" (১০ঃ৫৮)। এই জন্য ইহাকে শ্রুতিপুস্তক বলিতে পারি না। বরং ইহা শক্তিশালী অপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি ও দলিল প্রমাণ সঙ্গে রাখে এবং ইহাতে এক অত্যুজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়।

এই প্রকারের যৌক্তিক প্রমাণ, যাহা নির্ভুল প্রস্তাবনা দ্বারা সিদ্ধান্ত খাড়া করে, নিঃসন্দেহে 'ইল্‌মুল একীনে' পৌঁছায়। ইহারই প্রতি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(আলে-ইমরান, **3 : 191-192**)

অর্থাৎ, "যখন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী মানুষ পৃথিবী ও আকাশের গ্রহ নক্ষত্রসমূহের গঠন এবং রাত্রি ও দিনের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তখন এই সুরচিত শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টিপাতে তাহারা খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ পায়। অতঃপর, তাহারা আরও রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য খোদার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও পার্শ্বপরিবর্তনে শুইয়া তাঁহাকে স্মরণ করে। ইহাতে তাহাদের যুক্তি ও বুদ্ধি বহুল পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর, তাহারা যখন সেই যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমন্ডলী ও পৃথিবীর সুনিপুণ ও উৎকৃষ্ট গঠন লইয়া আরও চিন্তা করে, তখন তাহাদের মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হয়ঃ 'এমন সুনিপুণ ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলা কখনও বৃথা ও নিষ্ফল নহে, বরং ইহা প্রকৃত স্রষ্টার চেহারা প্রদর্শন করিতেছে।' তখন তাহারা বিশ্ব স্রষ্টার উলুহীয়্যত (ঈশ্বরত্ব) স্বীকার করিয়া মুনাজাত করে ঃ 'এলাহী! ইহা হইতে তুমি পবিত্র যে, কেহ তোমার সত্তা অস্বীকার করিয়া অনুপযুক্ত গুণাবলী তোমার প্রতি আরোপ করে। অতএব, তুমি আমাদিগকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।' অর্থাৎ, তোমাকে অস্বীকার করাই সাক্ষাৎ দোযখ। যাবতীয় আরাম ও শান্তি তোমাতে এবং তোমাকে চেনার মধ্যে।

যে ব্যক্তি তোমাকে সত্যিকার চেনা হইতে বঞ্চিত, প্রকৃতপক্ষে সে এই পৃথিবীতেই অগ্নির মধ্যে রহিয়াছে" (৩ঃ১৯১-১৯২)।

মানব স্বভাব-তত্ত্ব

এই প্রকারেই জ্ঞান লাভের এক উপায় মানুষের বিবেক। খোদার কিতাবে ইহার নাম মানব-প্রকৃতি রাখা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্তালা বলেনঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ؕ (সূরা রুম, 30 : 31)

অর্থাৎ, "খোদার স্বভাব (ফিত্রত), যাহার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে," (৩০ঃ৩১)। স্বভাবের সেই নক্শা কী? ইহাই যে, খোদাকে ওয়াহেদ, লা-শরীক (এক-অদ্বিতীয় ও অংশীহীন), সর্বস্রষ্টা জানা এবং মৃত্যু ও জন্ম হইতে পবিত্র জ্ঞান করা। আমরা বিবেককে 'ইলমুল একীনের' মর্যাদায় এই জন্য স্থান দিই যে, যদিও প্রকাশ্যভাবে ইহাতে এক জ্ঞান হইতে অন্য জ্ঞানের দিকে মোড় নেওয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন ধূম্রের জ্ঞান হইতে অগ্নির জ্ঞানের দিকে চিন্তার মোড় নেওয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি এক প্রকার সূক্ষ্ম গতিধারা হইতে এই পর্যায় খালি নহে এবং তাহা এই যে, প্রত্যেক জিনিষে খোদা এক অজানা বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন, যাহা বর্ণনা বা বক্তৃতার মধ্যে আসিতে পারে না। কিন্তু ঐ জিনিষের উপর নজর করিলে এবং উহা লইয়া চিন্তা করিলে অচিরাৎ ঐ বৈশিষ্ট্যের দিকেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ঐ বৈশিষ্ট্য এই সত্তার জন্য এমনই অপরিহার্য যেমন অগ্নির জন্য ধুম্র অপরিহার্য। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন আমরা খোদাতা'লার সত্তার দিকে ধ্যান নিবদ্ধ করি যে, তিনি কীরূপ হওয়া দরকার, খোদা কি এমন হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিবেন, আমাদের মত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবেন এবং আমাদের মতই মৃত্যুবরণ করিবেন, তখনই এই ধারণা দ্বারা আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়, বিবেক কাঁপিয়া ওঠে এবং এত উত্তেজনা দেখায় যেন উহা এই ধারণাকে নাড়া দিতেছে এবং চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে যে, সেই খোদা যাঁহার শক্তির উপর সব আশা ভরসা নির্ভর করে, তাঁর সর্ব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পবিত্র, পূর্ণ এবং শক্তিমান হওয়া চাই। যখনই খোদার

ধারণা আমাদের হৃদয়ে জাগে, তখনই তৌহীদ এবং খোদার মধ্যে, ঠিক ধুম্র ও অগ্নির সম্পর্কের ন্যায়, বরং তদপেক্ষাও অধিক নিগুঢ় সম্পর্কের অনুভূতি হয়। সুতরাং, যে জ্ঞান আমরা আমাদের বিবেকের সাহায্যে লাভ করি, তাহা 'ইলমুল একীনের' পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ইহার আরও এক পর্যায় আছে, যাহাকে 'আইনুল একীন' বলা হয়। এই পর্যায়ের দ্বারা সেই প্রকারের জ্ঞান বুঝায়, যেখানে আমাদের একীন এবং একীনের বস্তুর মধ্যে কোন মধ্যস্থ থাকে না। দৃষ্টান্তস্থলে, যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব করি, আমাদের জিহ্বা দ্বারা মিষ্টি বা লবণ সম্বন্ধে অবহিত হই, কিংবা ত্বক দ্বারা গরম বা ঠান্ডা অনুভব করি, তখন এই সকল জ্ঞান আমাদের 'আইনুল একীন' বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভাগভুক্ত হয়। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে আমাদের অতিন্দ্রীয় জ্ঞান তখনই 'আইনুল একীন'-এর সীমানায় পৌঁছায়, যখন আমরা স্বয়ং সাক্ষাতভাবে এলহাম পাই, খোদার বাণী নিজ কর্ণে শুনি এবং খোদার পরিষ্কার ও সত্য কাশ্‌ফসমূহ স্বচক্ষে দেখি। নিঃসন্দেহে আমরা পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানলাভের জন্য বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি এলহামের মুখাপেক্ষী এবং এই পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান দেখি। খোদাতা'লা যদি আমাদের জন্য ইতিপূর্বেই এই মা'রেফতের (তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের) আয়োজন না করিয়া থাকেন, তবে এই ক্ষুধা ও পিপাসা আমাদিগকে কেন দিয়াছেন? আমরা কি ইহজীবনে, যাহা আমাদের পরকালের মূলধনের জন্য একমাত্র পরিমাপক, এই কথায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারি যে, শুধু উপকথারূপে আমরা সেই সত্য, পূর্ণ ও জীবিত খোদার উপর ঈমান আনি বা নিছক যুক্তিসম্মত জ্ঞানকে যথেষ্ট বিবেচনা করি, যাহা এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত? খোদার সত্যিকার প্রেমিক ও প্রকৃত আত্মনিবেদনকারীর হৃদয় কি চায় না যে, তাহারাও তাহাদের পরম প্রেমাস্পদের বাজী লাভে আনন্দিত হউক? যাঁহারা খোদার জন্য সমগ্র সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয় সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন ও প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, তাহারা কি এ কথায় তুষ্ট থাকিতে পারেন যে, শুধু একটা ধুম্রময় আলোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহারা মরিয়া যান এবং সত্যের সেই মহাসূর্যের মুখ দর্শন না করেন? ইহা কি

সত্য নহে যে, সেই জীবিত খোদার মহান আহ্বান বাণী (আমি আছি) এরূপ মর্যাদা দান করে যে, পৃথিবীর সব দার্শনিকের স্বহস্তে রচিত পুস্তকরাশি যদি পাল্লার এক দিকে রাখা হয় এবং অন্য দিকে রাখা হয় খোদার اَنَاالْمَوْجُوْد 'আমি আছি' বাণীটি, তাহা হইলে শেষোক্তের মোকাবিলায় ঐ সব গ্রন্থ ভান্ডার তুচ্ছ হইয়া যাইবে? যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও স্বয়ং অন্ধ, তাহারা আমাদিগকে কী শিখাইবে? বস্তুতঃ যদি খোদাতা'লা সত্যের অন্বেষণকারীগণকে কামেল মা'রেফত (পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান) দানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাঁহার বাক্যালাপের পথ খোলা রাখিয়াছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লাহ শানুহু কুরআন শরীফে বলেন ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

(সূরা ফাতিহা, 1 : 6-7)

অর্থাৎ, "হে খোদা। আমাদিগকে এস্তেকামতের সেই পথ দেখাও, যে পথ ঐ সকল লোকের, যাহারা তোমার পুরস্কার লাভ করিয়াছে" (১ঃ৬-৭)। এখানে পুরস্কার দ্বারা এলহাম, কাশ্‌ফ প্রভৃতি ঐশী-জ্ঞানকে বুঝায়, যাহা মানুষ সরাসরি পাইয়া থাকে। এই প্রকারেই, অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا

تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ○(41:31 ,সূরা হা-মিম আস্ সাজদা)

অর্থাৎ, "যাঁহারা খোদার উপর ঈমান আনিয়া পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহাদের নিকট খোদাতা'লার ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে এই এলহাম করে ঃ "তোমরা কোন ভয় করিও না এবং দুঃখিত হইও না। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌ত আছে" (৪১ঃ৩১)। সুতরাং এই আয়াতেও সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লার পুণ্যবান বান্দাগণ দুঃখ ও ভয়ের সময়ে খোদা হইতে এলহাম প্রাপ্ত হন। ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ط (সূরা ইউনুস, 10 : 65)

অর্থাৎ, "খোদার বন্ধুগণ এলহাম এবং খোদার বাক্যালাপ দ্বারা ইহলোকেই সুসংবাদ প্রাপ্ত হন এবং পরলোকেও প্রাপ্ত হইবেন" (১০ঃ৬৫)।

এলহাম (ঐশী-বাণী) বলিতে কী বুঝায়?

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'এলহাম' শব্দ দ্বারা এখানে ইহা বুঝায় না যে, চিন্তা-ভাবনার কোন কথা মনের মধ্যে উদয় হওয়া। যেমন, কোন কবি কবিতা রচনা করার চেষ্টা করিতে থাকিলে, বা এক পদ তৈরী করিয়া অন্য পদ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকিলে, তখন দ্বিতীয় পদ মনে উদিত হয়। এইভাবে মনে উদয় হওয়া এলহাম নহে। বরং ইহা খোদার প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নিজ চিন্তার একটা ফল মাত্র। যে ব্যক্তি ভাল বিষয় লইয়া চিন্তা করে বা কুবিষয়ে চিন্তা করে, তাহার অনুসন্ধান অনুযায়ী কোন কথা অবশ্যই তাহার মনে উদিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে এক সাধু ব্যক্তি সত্যের সাহায্যার্থে এক কবিতা রচনা করিয়াছে এবং এক দুষ্ট ও অপবিত্র ব্যক্তি তাহার কবিতায় অসত্যের সহায়তা করিতেছে এবং সাধুগণকে গালি দিতেছে। এই অবস্থায় উভয়েই কিছু কবিতা রচনা করিবে। বরং ইহাও বিচিত্র নহে যে, সাধুগণের শত্রু, যে মিথ্যার সমর্থনে সদা অভ্যস্ত ও সিদ্ধহস্ত, বেশী ভাল কবিতা লিখে। সুতরাং, যদি শুধু মনে কোন কথা উদিত হওয়ার নাম এলহাম হয়, তাহা হইলে সাধুগণের শত্রু এক কুকর্মরত কবিও সর্বদা সত্যের বিরোধিতায় কলম ধারণ এবং নানা প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও খোদার মুলহাম বা এলহামপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইবে। পৃথিবীতে উপন্যাস জাতীয় রচনার মধ্যে ইন্দ্রজালের ন্যায় লেখা পাওয়া যায় এবং আপনারা দেখিয়া থাকেন যে, সর্বৈব মিথ্যা হইলেও এই প্রকারের ধারাবাহিক রচনা লোকের মনে আসে। আমরা কি এগুলিকে এলহাম বলিব? বরং যদি কেবল কোন কোন কথা মনে উদ্রেক হওয়ার নাম এলহাম হয়, তবে এক চোরও মুলহাম বলিয়া কথিত হইতে পারে। কারণ সে অনেক সময় চিন্তা দ্বারা চুরি করিবার ভাল ভাল পথ বাহির করে, ডাকাতি ও অন্যায় খুনের চমৎকার উপায় তাহার মনে ভীড় জমায়।

এখন কি এইসব অপবিত্র নাপাক উপায় উদ্ভাবনার নাম এলহাম রাখা সঙ্গত হইবে? কখনও নহে। বরং ইহা সেই সকল লোকদের ধারণা, যাহারা এখনও পর্যন্ত সেই প্রকৃত খোদার খবর রাখে না, যিনি স্বয়ং বিশেষ বাক্যালাপ দ্বারা হৃদয়ে সান্ত্বনা দেন এবং যাহারা অবহিত নহে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা স্বীয় পরিচয় ও তত্ত্ব-জ্ঞান দান করেন।

এলহাম কী? সেই পবিত্র ও শক্তিমান খোদা কোন অভিষিক্ত বান্দার সহিত, কিংবা যাহাকে তিনি মনোনীত করিতে চাহেন, তাহাকে এক জীবন্ত ও শক্তিশালী বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ ও সম্বোধন করেন। অতঃপর এই সম্ভাষণ ও সম্বোধন যখন যথেষ্ট পরিমাণে এবং সান্ত্বনাদায়ী ধারায় আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহাতে কোন বিকৃত কল্পনার অন্ধকার থাকে না, এবং ঐ সমুদয় অকিঞ্চিতকর এবং কতিপয় অসংলগ্ন শব্দ সংকলন না হইয়া বরং সুমধুর মহা জ্ঞানপূর্ণ, মহা গৌরবান্বিত ও তেজময় বাক্য হয়, তখন উহাই খোদার কথা, যদ্বারা তিনি তাঁহার বান্দাকে সান্ত্বনা দান করেন। এবং তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন। অবশ্য, কোন কথা তিনি পরীক্ষার্থেও করিয়া থাকেন। উহার সহিত পূর্ণ এবং কল্যাণপ্রদ সম্ভার থাকে না। এতদ্বারা খোদাতা'লার বান্দা হইতে তাহার প্রাথমিক অবস্থার পরীক্ষা লওয়া হয়। এলহামের কণা বিশেষের স্বাদ গ্রহণ করিয়া হয় সে স্বীয় চালচলন প্রকৃত মুলহামের ন্যায় বানাইবে নয়তো পদস্খলিত হইয়া যাইবে। সুতরাং, যদি সে মহা সত্য পরায়ণ সিদ্দীকগণের ন্যায় প্রকৃত সাধুতা অবলম্বন না করে, তাহা হইলে এই নেয়ামতের পূর্ণতা হইতে সে বঞ্চিত রহিয়া যাইবে। তাহার হাতে থাকিয়া যায় বৃথা আস্ফালন মাত্র। কোটি কোটি পুণ্যবান বান্দা এলহাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের মর্যাদা খোদার নিকট একই পর্যায়ের নহে। বরং খোদার পবিত্র নবীগণ যাঁহারা খোদার নিকট হইতে প্রথম শ্রেণীর পূর্ণোজ্জ্বল এলহাম প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও মর্যাদায় পরস্পর সমান নহেন। খোদাতা'লা বলেন ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (সূরা বাকারা, 2 : 254)

অর্থাৎ, "কতক নবী অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন" (২ঃ২৫৪)। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এলহাম শুধু অনুগ্রহ। শ্রেষ্ঠত্বের সহিত

ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বরং ফযিলত সেই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার মানের উপর নির্ভর করে, যাহা একমাত্র খোদা জানেন। অবশ্য, এলহামও যদি আপন আশিসযুক্ত ও শর্তাবলীসহ হয়, তাহা হইলে ইহাও ঐ সবের এক ফল। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এলহাম যদি এ প্রকারে হয় যে, বান্দা জিজ্ঞাসা করে এবং খোদা উহার উত্তর দেন এবং এই প্রকারে পারস্পরিক অন্বয়সহ যদি ধারাবাহিক প্রশ্ন ও উত্তর চলিতে থাকে এবং এলহামের ঐশ্বরিক শক্তি ও আলোক দৃষ্ট হয় এবং উহা ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান বা বিশুদ্ধ তত্ত্বাবলী সম্বলিত হয়, তাহা হইলে উহা খোদার এলহাম। খোদার এলহামে ইহা জরুরী যে, এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুর সাথে মিলনে পরস্পর বাক্যালাপ করে, তেমনই প্রভু-প্রতিপালক ও তাঁহার বান্দার মধ্যে কথোপকথন হয়। বান্দা যখন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন উহার উত্তরে সে এক সমধুর প্রাঞ্জল কালাম খোদাতা'লার দিক হইতে শুনিতে পায়। ইহাতে তাহার প্রবৃত্তির বা চিন্তাভাবনার কোন দখল মোটেই থাকে না। সম্ভাষণ ও সম্বোধন যদি প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ না হইয়া তাহার প্রতি সোজাসুজি দান হিসাবে আসে, তবে উহা নিশ্চয়ই খোদার কথা। কিন্তু দান হিসাবে এলহাম লাভের সৌভাগ্য ও মর্যাদা সকল মুলহামদের ভাগ্যেও জোটে না। খোদার বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, জীবন্ত ও পবিত্র প্রাণ-সঞ্চারী বাণী ও এলহামের ধারা কেবল ঐ সকল মহা মর্যাদাসম্পন্ন লোকের ভাগ্যেই জোটে, যাহারা ঈমান, আমলে-সালেহ্, আন্তরিকতা ও পবিত্রতায় চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। পবিত্র ও সত্য এলহাম ঈশ্বরত্বের বড় বড় অলৌকিক ও আশ্চর্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক সময় অত্যুজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি হয় এবং তৎসঙ্গে গৌরবময় এবং সমুজ্জ্বল এলহাম আসে। ইহা অপেক্ষা বড় গৌরব আর কী হইতে পারে যে, মুলহাম সেই সত্তার সহিত কথা বলে, যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের স্রষ্টা। পৃথিবীতে খোদার নৈকট্য ইহাই। খোদার সহিত কথা বলাই খোদার দীদার। আমাদের এই বর্ণনায় মানুষের ঐ অবস্থা অন্তর্ভুক্ত নহে, যাহাতে কাহারও মুখে অনির্দিষ্ট, অসংলগ্ন কোন শব্দ বা বাক্য বা শ্লোক বাহির হয় এবং যাহার সহিত ধারাবাহিক

কোন বাক্যালাপ ও সম্ভাষণ থাকে না। এই রকম মানুষ খোদার পরীক্ষায় নিপতিত। কেননা, খোদা এই প্রকারেও অলস ও গাফিল বান্দাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন যে, কখনও কোন বাক্য বা বাক্যসমষ্টি কাহারও মনে বা মুখে জারি করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি অন্ধবৎ হইয়া পড়ে। সে জানে না যে, সেই বাক্যসমষ্টি কোথা হইতে আসিল, খোদা হইতে না শয়তান হইতে। সুতরাং এই প্রকার বাক্য হইতে এস্তেগফার করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদি কোন পুণ্যবান বান্দার সহিত আবরণমুক্ত ঐশী বাক্যালাপ শুরু হইয়া যায় এবং এক প্রকার উজ্জ্বল সুমধুর, অর্থপূর্ণ, তাত্ত্বিক সম্বোধন ও সম্ভাষণের ধারায় কথামৃত সগৌরবে তাহার কর্ণে পৌঁছায় এবং কমপক্ষে কয়েকবার এ রকম হয় যে, খোদার মধ্যে এবং তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় দশ বার প্রশ্ন ও উত্তর চলে, সে জিজ্ঞাসা করে এবং খোদা উত্তর দেন, আবার সেই সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় সে অন্য কোন আবেদন করে এবং খোদা উহারও উত্তর দেন, আবার সে কাতর প্রার্থনা করে এবং তিনি উহারও উত্তর দেন, এই প্রকারে দশ বার পর্যন্ত খোদা ও তাহার মধ্যে বাক্যালাপ হইতে থাকে, এবং খোদা বার বার এসব বাক্যালাপে দোয়া কবুল করেন, ভাল ভাল তত্ত্ব তাহাকে শিক্ষা দেন, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর খবর তাহাকে দেন এবং স্পষ্ট অবারিত বাক্য দ্বারা বার বার প্রশ্নোত্তরে তাহাকে সম্মানিত করেন, তাহা হইলে খোদাতা'লার নিকট এহেন মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য এবং খোদার পথে সর্বাপেক্ষা বেশী বিলীন হওয়া উচিত। কারণ খোদা শুধু আপন করুণায় তাঁহার সব বান্দা হইতে তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে পূর্ববর্তী সিদ্দীকগণের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। এই সম্পদ অতি দুর্লভ এবং পরম সৌভাগ্যের বস্তু। ইহা চরম প্রাপ্তি। ইহার পর অন্য যাহা কিছু থাকে, সবই তুচ্ছ।

ইসলামের বিশেষত্ব

এই মর্যাদা এবং এই মকামের লোক ইসলামে সর্বদাই সৃষ্টি হইয়াছে এবং একমাত্র ইসলামেই খোদা বান্দার সন্নিকট হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন এবং তাহার অন্তরে কথা বলেন। তিনি তাহার হৃদয়ে

তাঁহার সিংহাসন স্থাপন করেন এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে আকাশের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তাহাকে ঐ সমস্ত নেয়ামত দেন, যাহা পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় যে, অন্ধ দুনিয়া জানে না যে, মানুষ নৈকট্য লাভ করিতে করিতে কোথায় গিয়া পৌঁছায়। দুনিয়া নিজে খোদার দিকে অগ্রসর হয় না এবং যদি কেহ অগ্রসর হয়, তবে হয় তাহাকে 'কাফের' নির্ধারণ করা হয় অথবা তাহাকে উপাস্য নির্ধরাণ করিয়া খোদার আসনে বসানো হয়। উভয় কাজই অন্যায়। একটি সীমাতিক্রমে হয় এবং অন্যটি হয় সীমানার কাছেও না যাওয়ায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কর্তব্য, সে সাহস হারাইবে না এবং এই মকাম ও এই মর্যাদাকে অস্বীকার করিবে না। এহেন মর্যাদাবান পুরুষের মানহানি করিবে না এবং তাহার পূজাও শুরু করিয়া দিবে না। এই পর্যায়ে খোদাতা'লা এহেন বান্দার নিকট এমন সম্পর্ক প্রকাশ করেন, যেন তাহাকে তিনি তাঁহার উলুহীয়্যতের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের চাদর পরিধান করাইয়া দেন। এহেন ব্যক্তি খোদা দর্শনের দর্পণে পরিণত হয়। ইহাই সেই রহস্য, যাহা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'যে আমাকে দেখিয়াছে, সে খোদাকে দেখিয়াছে।' বস্তুতঃ, ইহা বান্দাগণের জন্য পরম ও চূড়ান্ত সতর্কবাণী। এখানেই সকল চলা শেষ হইয়া যায়, আর পূর্ণ শান্তিসহ ও স্বস্তি লাভ হয়।

প্রবন্ধ প্রণেতার ঐশীবাণী প্রাপ্তির মর্যাদা

আমি বিশ্ববাসীর প্রতি অন্যায় করিব, যদি আমি এখন ইহা প্রকাশ না করি যে, যে মকামের গুণাবলীর আমি আলোচনা করিলাম এবং আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকথনের যে পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিলাম, তাহা **খোদা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে দান করিয়াছেন, যেন আমি অন্ধদিগকে চক্ষু দান করি, অন্বেষণকারীগণকে সেই নিরুদ্দেশের উদ্দেশ দিই এবং সত্য গ্রহণকারীগণকে ঐ পবিত্র প্রস্রবণের সুসংবাদ দিই, যাহা লইয়া আলোচনা করেন অনেকেই কিন্তু প্রাপ্ত হন অল্প কয়েকজন।** আমি শ্রোতৃবর্গকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, সেই খোদা, যাঁহার মিলনে মানুষের মুক্তি ও অনন্ত সুখ নিহিত আছে, তাঁহাকে কুরআন শরীফের অনুসরণ ছাড়া কখনও পাওয়া সম্ভব নহে। হায়, আমি যাহা দেখিয়াছি লোকে যদি তাহা দেখিত

এবং আমি যাহা শুনিয়াছি লোকে যদি তাহা শুনিত, যদি তাহারা গল্প-গুজব ছাড়িত এবং সত্যের দিকে দৌড়াইত, তাহা হইলে কতই না ভাল হইত! সেই পূর্ণ জ্ঞানের উপায়, যদ্বারা খোদা দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন, সেই পয়সা বিধৌতকারী পানি যদ্বারা যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়, সেই দর্পণ, যদ্বারা সেই পরাৎপরের দর্শন লাভ হয়, এ সকলই সেই ঐশী বাক্যালাপ, যে সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। যাঁহার আত্মায় সত্যের অন্বেষণ আছে, তিনি উঠুন এবং অন্বেষণ করুন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, যদি আত্মাসমূহে সত্যিকার অন্বেষণ সৃষ্টি হয়, যদি হৃদয়সমূহে সত্যিকারের তৃষ্ণা জন্মে, তবে মানুষ এই পথের অন্বেষণ করুক, ইহার অনুসন্ধানে লাগিয়া যাউক। কিন্তু এই পথ কোন্ পন্থায় খুলিবে? আবরণ কোন্ চিকিৎসায় দূরীভূত হইবে? সকল অন্বেষণকারীকে এই নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, কেবল ইসলামই এই পথের সুসংবাদ দান করে। অন্য জাতিগণ খোদার এল্হামের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ তালা দিয়া মোহরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সুনিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখো, ইহা খোদার দিক হইতে মোহরযুক্ত তালা নহে, বরং বঞ্চিত হওয়ার কারণে ইহা মানুষের ছলনার তালা মাত্র। নিশ্চিত জানিও, আমরা যেমন চোখ ছাড়া দেখি না, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ব্যতীত কথা বলিতে পারি না, তেমনই সম্ভব নহে যে, আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয়ের মুখ দর্শন করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি এমন কাহাকেও পাই নাই, যে কুরআনের পবিত্র প্রস্রবণ ব্যতীত এই অবারিত মা'রেফতের (তত্ত্বজ্ঞানের) পেয়ালা পান করিয়াছে।

পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদাতা'লার এলহাম

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! কোন মানুষ খোদার সংকল্পের ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। নিশ্চিত জানিও, পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদাতা'লার এলহাম, যাহা খোদাতা'লার পবিত্র নবীগণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর করুণা-সিন্ধু খোদা কখনও ইহা চাহেন নাই যে, ভবিষ্যতে এলহাম বন্ধ করিয়া দেন এবং এই প্রকারে দুনিয়াকে ধ্বংস করেন। বরং তাঁহার এলহাম ও সম্বোধন ও সম্ভাষণের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। তবে হ্যাঁ, উহাকে সঠিক পন্থায় অন্বেষণ করিতে হইবে।

তবেই তোমরা উহা সহজে প্রাপ্ত হইবে। সেই জীবনবারি আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত স্থানে জমা হইয়াছে। এখন তোমাদের কী করা কর্তব্য, যাহাতে এই পানি পান করিতে পার? তোমাদের কর্তব্য ইহাই যে, উঠিয়া-পড়িয়া এই প্রস্রবণের নিকট পৌঁছাও। তারপর, প্রস্রবণে মুখ রাখ, যেন জীবনবারি পানে পরিতৃপ্ত হও। মানুষের পূর্ণ সৌভাগ্য ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যে যেখানেই সেই আলোর সন্ধান পায়, সেই দিকেই যেন সে দৌড়ায় এবং যেখানেই সেই হারান বন্ধুর চিহ্ন মিলে, সেই পথই যেন সে গ্রহণ করে। তোমরা সকল সময় দেখিতেছ, আলোক আকাশ হইতে নামিয়া আসে এবং পৃথিবীর উপর পড়ে। এই প্রকারেই হেদায়াতের প্রকৃত আলোক আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হয়। মানুষের নিজ বাক্য, ধারণা ও অনুমান তাহাকে সত্য জ্ঞান দিতে পারে না। তোমরা কি খোদাকে খোদার জ্যোতির্বিকাশ ছাড়া প্রাপ্ত হইতে পার? তোমরা কি আকাশের আলোক ছাড়া অন্ধকারে দেখিতে পাও? যদি দেখিতে পাও, তবে সম্ভবতঃ এখানেও দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও আকাশের আলোর প্রয়োজন আছে। যদিও আমাদের কর্ণে শ্রবণ-শক্তি থাকে, তবুও সেই বায়ুর প্রয়োজন, যাহা খোদার দিক হইতে প্রবাহিত হয়।। সেই খোদা প্রকৃত নহে, যে চুপ থাকে এবং যার প্রকাশ আমাদের কল্পনার উপর নির্ভর করে বরং কামেল ও জীবিত খোদা তিনিই, যিনি তাঁহার অস্তিত্বের সন্ধান নিজে দেন। এখনও তিনি ইহাই চাহিয়াছেন যে, তিনি নিজেই আপন অস্তিত্বের সন্ধান দিবেন। আকাশের বাতায়নসমূহ এখুনি খুলিয়া যাইবে। শীঘ্রই ভোর হইবে। ধন্য সে, যে উঠিয়া বসে এবং সত্য খোদার অন্বেষণ করে- সেই খোদার, যাঁহার উপর কোন দুর্যোগ এবং কোন বিপদ আসে না, যাঁহার প্রতাপের চমক কখনও মলিন হয় না। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ (সূরা নূর, 24 : 36)

অর্থাৎ, "একমাত্র খোদাই নিরন্তর আকাশের আলোক এবং পৃথিবীর আলোক" (২৪ঃ৩৬)। তাঁহারই নিকট হইতে সর্বত্র আলোকপাত হইয়া থাকে। সূর্যের উপর কিরণদাতা সূর্যও তিনিই। পৃথিবীর সব প্রাণীর

তিনিই প্রাণ। সত্য, জীবন্ত খোদা তিনিই। ধন্য সে, যে তাঁহাকে গ্রহণ করে।

জ্ঞানের তৃতীয় উপায় ও উৎস হইতেছে ঐ সকল বিষয়, যাহা অভিজ্ঞতালব্ধ ও 'হাক্কুল একীন' পর্যায়ভুক্ত। আর তাহা হইল ঐ সকল যাতনা, বিপদ ও কষ্ট, যাহা নবীগণ ও সাধু পুরুষগণ বিরুদ্ধবাদীগণের হস্তে বা ঐশী নিয়তির ফলে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারের দুঃখ-কষ্টের ফলে, যে সব শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা শুধু জ্ঞানের আকারে মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহা তাহার উপর অবতীর্ণ হইয়া কর্মের আকার ধারণ করে এবং কর্মের ক্ষেত্রে লালিত পালিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীগণের নিজ নিজ সত্তাই খোদার হেদায়াতের এক পূর্ণ ব্যবস্থাপত্রস্বরূপ হইয়া যায়। ক্ষমা, প্রতিশোধ, ধৈর্য, দয়া প্রভৃতি সব নৈতিক গুণ, যাহা শুধু মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়াছিল, এখন ব্যবহারিক অনুশীলণের কল্যাণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এগুলির প্রতিফলন ঘটে এবং সারা দেহে উহাদের নক্‌শা ও ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

(সূরা বাকারা, 2 : 156-158)

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

(সূরা আলে ইমরান, 3 : 187)

অর্থাৎ, "আমরা তোমাদিগকে ভয়, অনাহার, আর্থিক ক্ষতি, প্রাণের ক্ষতি, চেষ্টার ব্যর্থতা এবং সন্তান বিয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করিব।" অর্থাৎ

এই সব কষ্টই কাযা ও কদর (ঐশী মীমাংসা ও ঐশী বিধান) অনুযায়ী অথবা শত্রুর দ্বারা তোমাদিগের উপর বর্তিবে।

"অতএব তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও, যাহারা বিপদের সময়ও শুধু ইহাই বলে যে, 'আমরাও আল্লাহ্‌রই এবং আমরা আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাগমন করিব', তাহাদের প্রতি খোদার আশিস ও করুণা এবং তাহারাই হেদায়াতের চরমত্ব লাভ করিয়াছে" (২ঃ১৫৬-১৫৮)। অর্থাৎ, সেই জ্ঞানে কোনও শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা নাই, যাহা শুধু মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে জমা থাকে। বরং প্রকৃতপক্ষে, উহাই জ্ঞান, যাহা মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিনয়াবনত করিয়া দেয় এবং স্মরণশক্তিকে উপস্থিত বুদ্ধির আকারে কর্মে প্রকাশিত করে। সুতরাং, জ্ঞানকে মজবুত করিবার এবং উহাকে উন্নতি দেওয়ার বড় উপায় হইল কার্যতঃ উহার নক্‌শা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রূপায়িত করা। কোন সামান্য জ্ঞানও ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া পরিণত রূপ ধারণ করে না। এর দৃষ্টান্ত ইহাই যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একথা আছে, রুটি তৈরী করা খুব সহজ কাজ, ইহাতে কোন জটিলতা নাই। শুধু এতটুকু যে, পানি দিয়া আটা মাখাইয়া এক একটা রুটির জন্য খামির তৈরী করতে হয় এবং ঐগুলিকে দুই হাতে চাপ্‌ড়াইয়া চওড়া করিবার পর তাওয়ায় দিতে হয় এবং এদিকে ওদিকে ঘুরাইয়া আগুনে সেঁকিয়া লইলেই রুটি হয়। ইহা আমাদের শুধু মৌখিক জ্ঞানের কথা। কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় পাক করিতে বসি, সর্ব প্রথম আটা দিয়া উপযুক্ত খামির তৈরী করাই আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে। হয় উহা পাথরের ন্যায় শক্ত থাকিবে নয় পাতলা হইয়া গুলগোলার উপযোগী হইবে। কোন রকম আটা গুঁতিয়া লইলেও রুটির অবস্থা এমন হইবে যে, কতকটা পুড়িয়া যাইবে এবং কতকটা কাঁচা থাকিবে, মধ্যকার অংশটা গোলাকার হইবে এবং চারিদিক দিয়া কান বাহির হইবে। অথচ পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী আমরা রুটি তৈরী করা দেখিয়া আসিতেছি। বস্তুতঃ নিছক চোখের দেখা জ্ঞান দ্বারা, যাহা স্বকীয় ব্যবহারিক অনুশীলনে আসে নাই, আমরা কয়েক সের আটা নষ্ট করিব। অতএব যখন সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের এই অবস্থা, তখন বড় বড় ব্যাপারে ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া শুধু বাহ্যিক জ্ঞানের উপর

কি প্রকারে ভরসা করা যায়? সুতরাং খোদাতা'লা এই আয়াতগুলিতে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি আমাদিগকে যেসব বিপদাপদে ফেলেন, তাহাও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপায়। অর্থাৎ, তদ্বারা আমাদের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে।

অতঃপর বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে তোমাদের ধন ও প্রাণের দিক হইতে পরীক্ষা করা হইবে। লোকে তোমাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করিবে, তোমাদিগকে হত্যা করিবে। তোমরা ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুশরেকদের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করিবে। তাহারা তোমাদের সম্পর্কে অনেক বেদনাদায়ক কথা বলিবে। অতঃপর যদি তোমরা সবুর কর এবং অযথা উত্তেজিত না হও, তবে ইহা সাহস ও বিক্রমের কার্য হইবে" (৩ঃ১৮৭)। এই আয়াতগুলির তাৎপর্য এই যে, আশিসযুক্ত জ্ঞান উহাই, যাহা ব্যবহারিক পর্যায়ে আপন চমক দেখায় এবং শূণ্যগর্ভ জ্ঞান উহা, যাহা শুধু জানার পর্যায়ে আছে এবং কাজে লাগানো হয় নাই।

জানা আবশ্যক, যেমন বাণিজ্যের দ্বারা অর্থশক্তি বাড়ে ও অর্থ বৃদ্ধি হয়, তেমনই জ্ঞান, ব্যবহারিক অনুশীলন দ্বারা পূর্ণতা লাভের পরিণতিতে রূহানী পূর্ণতায় পৌঁছায়। সুতরাং, জ্ঞানের উৎকর্ষতার বড় উপায় ব্যবহারিক অনুশীলন। অনুশীলনে জ্ঞান জ্যোতির্ময় হয়। ইহাও অবহিত হও যে, জ্ঞান 'হাক্কুল একীন' পর্যায়ে পৌঁছানোর অর্থ, ব্যবহারিক উপায়ে উহার প্রত্যেকাংশ পরীক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইসলামে ইহাই হইয়াছে। যাহা কিছু খোদাতা'লা কুরআন দ্বারা লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এই সুযোগও দিয়াছিলেন, যেন ব্যবহারিক উপায় এই শিক্ষাকে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলে এবং উহার আলোকে আলোকিত হয়।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জীবনের দুই যামানা

উক্ত উদ্দেশ্যেই খোদাতা'লা আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবন দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন।

এক ভাগ দুঃখ বিপদ ও কষ্টের এবং দ্বিতীয় ভাগ বিজয়ের। ইহাতে উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বিপদের সময়ে কতকগুলি চারিত্রিক গুণের বিকাশ হয়, যাহা কেবল বিপদের সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে; বিজয় ও ক্ষমতার সময়ে ঐ সকল চারিত্রিক গুণ প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃ এই প্রকারেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উভয় প্রকার চারিত্রিক মাহাত্ম্য দুই সময়ে দুই অবস্থায় প্রকাশিত হওয়ায়, পূর্ণাঙ্গীণভাবে স্পষ্টাকারে সাব্যস্ত হইয়াছে মক্কা মোয়ায্যামায় তের বছর যে বিপদের যুগ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়কার জীবনী পাঠে ইহা সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিপদের সময় পরম সাধুর জন্য যে চরিত্র প্রদর্শন করা দরকার অর্থাৎ খোদার উপরে ভরসা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা হইতে দূরে থাকা, কর্মে শিথিল না হওয়া, কাহারও প্রভাবের ভয় না করা, এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমনভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কাফেরগণ ঈদৃশ ধৈর্য দর্শনে ঈমান আনিয়াছিল এবং সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই প্রকার এস্তেকামত দেখাইতে ও এই প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। অতঃপর, যখন দ্বিতীয় যুগ উপস্থিত হইল অর্থাৎ বিজয়, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির যুগ আসিল, সেই সময়েও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন ক্ষমতা, বদান্যতা এবং বিক্রম এরূপ চরম আকারে প্রকাশিত হইল যে, কাফেরগণের এক বিরাট দল এই সব উন্নত চরিত্র দেখিয়াই ঈমান আনিয়াছিল। যাহারা অশেষ ও অসহনীয় কষ্ট দিত, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন, যাহারা তাঁহাকে শহর হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিলেন, তাহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি অর্থদানে অর্থশালী করিলেন এবং নিজের হাতের মুঠায় পাইয়াও বড় বড় শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিলেন। ফলে অনেক লোক তাঁহার চরিত্র দর্শনে সাক্ষ্য দিল যে, কেহ খোদার পক্ষ হইতে না হইলে এবং প্রকৃত সাধু না হইলে, এহেন চরিত্র কখনও দেখাইতে পারে না। এই কারণেই তাঁহার শত্রুদের পুরাতন প্রতিহিংসা হঠাৎ লোপ পাইল।

তাঁহার মহান সদ্‌গুণাবলী যাহা তিনি মাঠে-ময়দানে ও গৃহাভ্যন্তরে সাব্যস্ত করিয়া দেখাইলেন, তাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ (সূরা আনআ'ম, 6 : 163)

অর্থাৎ, "তাহাদিগকে বলঃ আমার এবাদত, আমার কুরবানী, আমার মরণ, আমার জীবন খোদার পথে উৎসর্গীকৃত, অর্থাৎ এসব তাঁহার বিক্রম প্রকাশার্থে এবং তাঁহার বান্দাগণকে আরাম দেওয়ার জন্যই, যাহাতে আমার মৃত্যুতেও তাহারা জীবন লাভ করে" (৬ঃ১৬৩)। এস্থানে খোদার পথে এবং বান্দার হিতার্থে মৃত্যুর কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে যেন কেহ মনে না করে যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ্ অজ্ঞদের বা উন্মাদগণের ন্যায় আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াছিলেন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, নিজেকে কোন মারণাস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করিলে অন্যদের উপকার হইবে। বরং তিনি এই প্রকার নিষ্ফল ক্রিয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কুরআন এই প্রকার আত্মহত্যাকারীকে মহাপরাধী ও দণ্ডার্হ বলিয়া নির্ধারণ করে। যেমন বলা হইয়াছে ঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّهْلُکَةِ (সূরা বাকারা, 2 : 196)

অর্থাৎ, "আত্মহত্যা করিবে না এবং স্বহস্তে স্বীয় মৃত্যুর কারণ হইবে না" (২ঃ১৯৬)।

প্রকাশ্যকথা, দৃষ্টান্তস্থলে, খালেদের উদরশূল হওয়ায়, যায়েদ তাহার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নিজ মাথা ফাটাইলেও যায়েদ খালেদের জন্য কোনই পুণ্যকর্ম করিল না। বরং এই নির্বোধ ক্রিয়া দ্বারা অযথা আপন মস্তক ফাটাইল মাত্র। পুণ্যকর্ম তবেই হইত, যদি যায়েদ খালেদের সেবায় যথোপযুক্ত হিতকর চেষ্টায় তৎপর হইত, তাহার জন্য উত্তম ঔষধের আয়োজন করিত এবং চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী তাহার শুশ্রূষা করিত। কিন্তু নিজ মাথা ফাটানোর ফলে খালেদের কোন উপকার হইল না। অযথা সে তাহার আপন দেহের এক মহান অংশকে দুঃখ প্রদান করিল। বস্তুতঃ এই আয়াতের মর্ম ইহাই যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই সহানুভূতি ও পরিশ্রমের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। দোয়ার দ্বারা, প্রচারের দ্বারা,

তাহাদের অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করার দ্বারা, সব রকমের উপযুক্ত বিজ্ঞোচিত পন্থাবলম্বনের দ্বারা তাঁহার প্রাণ এই পথে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ○ (সূরা শু'আরা, 26 : 4)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ط (সূরা ফাতির, 35 : 9)

অর্থাৎ, "তুমি জনগণের জন্য যে দুশ্চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, তদ্বারা কি নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে? যাহারা সত্যকে গ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য কি তুমি দুঃখ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে"? (২৬ঃ৪,৩৫ঃ৯) সুতরাং, জাতির উদ্দেশ্যে প্রাণ দানের সুবুদ্ধি ইহাই যে, জাতির মঙ্গলার্থে প্রাকৃতিক বিধান-সম্মত হিতকর পন্থানুযায়ী নিজ আত্মার উপর কষ্ট বরণ করা এবং চেষ্টা-তদ্বীর দ্বারা তাহাদের জন্য প্রাণোৎসর্গ করা। ইহা নহে যে, জাতিকে মহাবিপদাপন্ন বা বিপথগামী দেখিয়া বা তাহারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিপতিত দেখিয়া আপন মাথায় প্রস্তরাঘাত করা, বা দুই তিন রতি স্ট্রীকনিয়া (strychnia-এক প্রকার বিষ- প্রকাশক) খাইয়া ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করা এবং মনে করা যে, আমি এই অপকর্ম দ্বারা জাতির মুক্তি সাধন করিয়াছি। ইহা পুরুষোচিত কর্ম নহে। ইহা স্ত্রীলোকের স্বভাব। কাপুরুষেরা সর্বদা এই পন্থা অবলম্বন করে। বিপদ অসহনীয় ভাবিয়া তাড়াতাড়ি আত্মহত্যার দিকে দৌড়ায়। এই প্রকারের আত্মহত্যার যতই ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হউক না কেন, এই ক্রিয়া বুদ্ধ ও বুদ্ধিমানের জন্য যে লজ্জাকর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকার মানুষের ধৈর্য-ধারণ করা ও মোকাবিলা না করার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ প্রতিশোধ গ্রহণের তাহার সুযোগ হয় নাই। কে জানে সে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পাইলে কি না করিত। যে পর্যন্ত মানুষের ঐ সময় না আসে, যখন তাহার জীবন বিপদের পর বিপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং ঐ সময়ও না আসে, যখন সে ক্ষমতাসীন, রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্যের মালিক হয়, সে পর্যন্ত তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হইতে পারে না। স্পষ্ট কথা, যে ব্যক্তি কেবলই দুর্বল, অভাব ও অক্ষম অবস্থায় লোকের মার খাইতে খাইতে মরে এবং ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও

ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় না, তাহার সত্যিকার সাধু চরিত্র প্রকাশিত হয় না। যে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে নাই, তাহার প্রমাণ নাই যে, সে বীরাত্মা ছিল না, কাপুরুষ ছিল। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, যেহেতু আমরা জানি না যে, সে শত্রুর উপর ক্ষমতা লাভ করিলে, তাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করিত এবং ঐশ্বর্য লাভ করিলে, সে অর্থ জমা করিত বা দান করিত। এবং কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সে লেজ গুটাইয়া পলায়ন করিত না বীরত্বের পরিচয় দিত। কিন্তু খোদার অনুগ্রহ ও কৃপা, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে উভয় অবস্থায় জীবন যাপন করার সুযোগ দিয়া এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাহাত্ম্য দান করিয়াছিলেন। ফলে বদান্যতা, বীরত্ব, গাম্ভীর্য, ক্ষমা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার স্ব স্ব স্থানে এমন উৎকৃষ্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভূপৃষ্ঠে ইহার তুলনা নাই। তাঁহার অক্ষমতা ও ক্ষমতার, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের দুই যুগেই সব বিশ্ববাসী দেখিয়াছে যে, সেই পবিত্রাত্মা কেমন উচ্চ পর্যায়ের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী ছিলেন। মানুষের নৈতিকতার এমন কোন উচ্চতম বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা প্রকাশের সুযোগ খোদাতা'লা তাঁহাকে দেন নাই। বীরত্ব, বদান্যতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য ইত্যাদি যাবতীয় উন্নত চারিত্রিক মহিমা এরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে উহার দৃষ্টান্ত মিলা অসম্ভব। অবশ্য ইহা সত্য যে, যাহারা অত্যাচারকে চরমে পৌঁছাইয়াছিল আর ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল, খোদা তাহাদিগকেও শাস্তি না দিয়া ছাড়েন নাই। কারণ তাহাদিগকে সাজা না দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সাধুগণকে তাহাদের পদতলে ধ্বংস করার নামান্তর হইত।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের উদ্দেশ্য

অনর্থক লোক হত্যা করা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুদ্ধগুলির কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাঁহার বাপ-দাদার দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। অনেক নিরপরাধ মুসলমান স্ত্রী-

পুরুষকে অকারণে শহীদ করা হইয়াছিল। তখনও অত্যাচারের নিবৃত্তি হয় নাই। ইসলামের শিক্ষায় বাধা দেওয়া হইতেছিল। সুতরাং, খোদার রক্ষা-বিধান চাহিল নির্যাতিতগণকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা করা হউক। সুতরাং যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইল। বস্তুতঃ হত্যাকারীদিগের হত্যার ফিৎনা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ও অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে, ঐ সকল যুদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধগুলি তখন করা হইয়াছিল, যখন অত্যাচারপ্রিয় লোকগণ সত্যের সেবকগণকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিতেছিল। এমতাবস্থায় যদি ইসলাম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিত, তবে সহস্র সহস্র নিরপরাধ শিশু ও স্ত্রীলোক নিহত হইত এবং ইসলাম থাকিত না।

স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ভীষণ বাড়াবাড়ি করিয়া ইহাই মনে করে যে, এলহামী হেদায়াত এমন হওয়া চাই যে, উহাতে কোন স্থানেই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা থাকিবে না। সর্বদা গাম্ভীর্য, সহ্য ও নম্রতার দ্বারা স্বীয় প্রেম ও দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। এরূপ ব্যক্তিগণ তাহাদের ধারণা অনুসারে খোদার সম্যক পূর্ণ গুণাবলীকে শুধু নম্রতার মধ্যেই শেষ করে। কিন্তু এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে সহজেই প্রত্যেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, উহারা কত বড় ও সুস্পষ্ট ভুল করিতেছে। খোদার প্রাকৃতিক বিধানে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট সাব্যস্ত হয় যে, উহা অবশ্যই পৃথিবীর জন্য কেবলই কৃপা। কিন্তু এই কৃপা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় নম্রতা ও মোলায়েম ব্যবহারের আকারে প্রকাশিত হয় না। বরং তিনি একমাত্র করুণার তাগিদে বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় কখনও মিষ্ট সিরাপ সেবন করিতে দেন এবং কখনও তিক্ত ঔষধ দেন। মানব জাতির প্রতি তাঁহার দয়া ঠিক সেইভাবে অবতীর্ণ হয়, যেমন আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের প্রতি মমতা রাখি। কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে না যে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সমগ্র অস্তিত্বকে ভালবাসে। যদি কেহ আমাদের একটি চুল ছিঁড়িতে চাহে, তবে আমরা তাহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হই। যদিও আমাদের দেহের প্রতি মমতা আমাদের গোটা দেহে ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সত্যিকারভাবে আমাদের নিকট প্রিয়, আমরা কোনটিরই ক্ষতি

চাহি না; তথাপি একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য যে, আমরা আমাদের সব অঙ্গের প্রতি সমান ও একই পর্যায়ের মমতা পোষণ করি না; বরং কোমল ও প্রধান অঙ্গগুলির ভালবাসা, যাহাদের উপর আমাদের উদ্দেশ্যের অনেক কিছু নির্ভর করে, আমাদের হৃদয়ে প্রবল থাকে। সেইরূপ আমাদের দৃষ্টিতে অঙ্গ সমষ্টির জন্য আমাদের ভালবাসা একটি অঙ্গের প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং যদি কখনও আমাদের এমন ঘটনার সম্মুখীন হইতেই হয় যে, কোন উচ্চ পর্যায়ের অঙ্গ রক্ষার্থে নিম্ন শ্রেণীর অঙ্গ কর্তন, ভঙ্গ বা জখম করিবার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা প্রাণ রক্ষার্থে কোন দ্বিধা না করিয়া সেই অঙ্গচ্ছেদ বা কর্তনে প্রস্তুত হই। যদিও তখন আমাদের হৃদয়ে এই বলিয়া দুঃখ হয় যে, আমরা আমাদের একটি প্রিয় অঙ্গকে জখম করিতেছি বা কাটিয়া ফেলিতেছি। তবুও আমরা এই ভাবিয়া উহা কর্তনে প্রস্তুত হই, পাছে না এই অঙ্গের অপকারিতা সুস্থ এবং কোমল অঙ্গগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে হইবে যে, খোদাও যখন দেখেন তাঁহার সাধু বান্দাগণ অসত্যের উপাসকদের হস্তে ধ্বংস হইতেছে এবং ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা বিস্তৃত হইতেছে, তখন তিনি সাধুগণের প্রাণ রক্ষা এবং ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটান আকাশ হইতেই হউক বা পৃথিবী হইতেই হউক; কেননা, তিনি যেমন পরম দয়াময় তেমনই পরম প্রজ্ঞাময়ও বটেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সকল প্রশংসা বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-